প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

চিত্রকলা কী ও কেন?

চিত্রকলা কী? কবে কোন যুগে শুরু হয়েছিল চিত্রকলার?. বলতে পারি যে মাধ্যমে রঙ ও তুলিতে মনের ভাব ও ধারণাকে বিকশিত করা যায় তাই চিত্রকলা। মন, জীবন, সমাজ ও প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার প্রায় সবকিছুই ধারণাসাপেক্ষ চিত্রে স্থান পেতে পারে। চিত্র বাস্তবিক, প্রতীকী, কাল্পনিক এমনকি অলীক বিষয় কেন্দ্রিক হতে পারে। শিল্পীর ধারণা বা ভাব থেকে সৃষ্ট হয় চিত্রকল্প, চিত্রকল্প থেকে শেষে তুলির মাধ্যমে বেরিয়ে আসে চিত্ররূপ। রঙ তুলি ও ক্যানভাসের মাধ্যমের চিত্রকল্প বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু সভ্যতার কোন লগ্নে শুরু হয়েছিল চিত্রাঙ্কন, তা বলা কঠিন। বলা যায় সভ্যতা ও চিত্র যাত্রা শুরু করেছিল একই সঙ্গে। আদিম মানুষ যখন নদীর বালুচরে হাত পা দিয়ে ইচ্ছাকৃত দাগ কাটতে শিখেছিল, কিংবা তৃণহীন মৃত্তিকার ওপর দীর্ঘ নখের আঁচড় দিয়ে নকশা কেটেছিল বা জ্ঞানে-অজ্ঞানে কোনও নকশা তৈরি করেছিল কিংবা আকাশের সুন্দর রামধনুর স্মৃতিমন্থন করতে গিয়ে সেইটিই নকশায় ফুটিয়ে তুলেছিল. অন্তস্থিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে– তখন থেকেই যে চিত্রের শুরু হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য।

কালের গতিপথে আদিম চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি যুগে যুগে নতুন কারুকুশলতার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিশীলিত ধারা ও রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সারা পৃথিবীর যে সকল স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন গড়নের মৃৎপাত্রে বিভিন্ন ধরনের চিত্র পাওয়া গেছে। যদিও আদিম গুহার চিত্রগুলি আরও প্রাচীনতর। সভ্যতার এক উন্নত স্তরে মৃৎপাত্রে চিত্রায়িত হয়েছে চিত্র। প্রাচীন চীনদেশে এবং গ্রীসের মৃৎপাত্রের চিত্র অতি আকর্ষণীয়। ভারতে হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রে চিত্রসমাবেশ কোনও অংশে কম নেই। আদিম গুহা থেকে চিত্রাঙ্কন শুরু হয়ে সভ্যতার গতিপথে মানুষের সৃজনশীলতা তার চিত্রসৃষ্টির ধারাকে প্রবহমান রেখেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রাচীন চিত্রসম্ভার মানুষের দৈনন্দিন জীবন, বাঁচার সংগ্রাম এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাতের কাহিনীর বর্ণনাই বেশি বহন করে। কোথাও পশু শিকারের দৃশ্য, জীবন সংগ্রামের চিত্র, ধর্মবিশ্বাস এবং নির্ভরযোগ্য সংগ্রামের হাতিয়ার চিত্রিত হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন, চিত্র অস্তিত্বে এল কেন? কিংবা চিত্রের জন্ম হল কেন? চিত্রসৃষ্টির কারণ হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায় –.

১. প্রকৃতি প্রেম

২. মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রেরণা

৩. নিজের ধারণাকে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে চিত্রের ব্যবহার

কিংবা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম হিসেবে চিত্রের আবির্ভাব।

৪. নান্দনিক অন্তর্দৃষ্টি

১। প্রকৃতি প্রেম ঃ

মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। জীবনের উৎস প্রকৃতি। চিন্তাশীল জীব হিসেবে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে অনুভব করতে, উপভোগ করতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে শিখেছে। মানুষ তার স্মৃতিতে প্রকৃতির রূপ, গন্ধ, ঋতুচক্রাবর্ত এবং পরিবর্তনের ধারাগুলিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। জীবন ও প্রকৃতির রূপকে ধরে রাখার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃতিপ্রেম এবং জীবনের প্রতি অন্তহীন গভীর আকর্ষণ। শুধু স্মৃতিতে নয়, তার সৃজনশীল কর্মে মানুষ প্রকৃতির রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে নকল করে ধরে রাখার প্রয়াস থেকেই মানুষের মনে বিকশিত হয়েছিল চিত্রকল্প এবং আবির্ভূত হয়েছিল চিত্ররূপ। আর সেই রূপ বিকাশে স্থান পেয়েছিল গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল, পর্বত-নদী, অরণ্য-সাগর, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, নারী ও পুরুষ, সুখ-দুঃখ, শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য ও মৃত্যু, মেঘাচ্ছন্ন ও মেঘমুক্ত আকাশ, ঋতুচক্রে প্রকৃতির পরিবর্তন এবং আরও অনেক কিছু। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই অব্যাহত রইল চিত্রসৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃতিপ্রেম, জীবনপ্রীতি, প্রকৃতির ধ্যান এবং প্রকৃতিকে জানা এবং নকল করার প্রচেষ্টা। তবে প্রকৃতিকে নকল করা কোনও কালেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মানুষ প্রকৃতির রূপকে নিজের ভাবনা চিন্তা এবং সৌন্দর্যের ধ্যানধারণা ও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। তাই কোনও চিত্র প্রকৃতির ফটোকপি নয়। প্রকৃতির নিরন্তর পরিবর্তনশীল রূপ চিত্রকরের স্মৃতিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার সঙ্গে নিজের ধ্যান যুক্ত হয়ে সৃষ্ট হয় চিত্রকল্প এবং কারুকুশলতার ফসল হিসেবে চিত্ররূপে স্থান পায় চিত্রপটে।

চিত্রকরের তুলিতে প্রকৃতির পরস্পরবিরোধী রূপ– সৃজনশীল ও ধ্বংসাত্মক, শান্ত ও ক্ষুব্ধ এই দুই রূপই স্থান পায়। প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ রূপ যেমন– চন্দ্রালোকিত রাত্রি, সুন্দর পুষ্পিত উপবন, পদ্ম সুশোভিত সরোবর মানুষের অজানিত রূপলোকের গভীরতায় আলোড়ন সৃষ্টি করে; তেমনি প্রকৃতির ভয়াল রূপ– ভূকম্পন, উত্তাল ঝড়, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত ও কম্পিত করে। জীবনের প্রাণস্পন্দ রূপে অপরদিকে প্রাণের বিলয়কারী রূপে প্রকৃতির দ্বৈত রূপ বিশ্বব্যাপী সর্বযুগের চিত্রকরদের তুলিতে রূপায়িত হয়েছে সমান যত্নে ও মনস্বিতায়। চিত্র হয়ে উঠেছে জীবন ও মৃত্যু, আলো ও অন্ধকারের প্রতিচ্ছবিরূপে।

২. মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রেরণা ঃ

মানুষের গুরুমস্তিষ্কের অংশটি অন্য যে কোনও জীবের মস্তিষ্কে অনুপস্থিত। মস্তিষ্কের এই অংশটি মানুষকে চিন্তাশীল ও সৃজনশীল করে প্রকৃতির বুকে তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মানুষের চিন্তনক্রিয়া ও সৃজনশীলতা তার অস্তিত্বের সমার্থক এবং তার অন্তর্নিহিত সত্তার স্বভাবজাত; সৃজনশীলতা মানুষের একান্ত স্বরূপ। সৃজনশীলতার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি ও জীবনকে নিজের মতো করে পেতে চায়। চিন্তা ও সৃজনশীলতা মানুষকে দিয়েছে কল্পনাশক্তি। এই সৃষ্টির চেতনার অধিকারী হয়ে মানুষ প্রকৃতির সম্পদ ও দানকে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়ে নিতে চায় দেশ ও কালের বাধা অতিক্রম করে। প্রকৃতিতে যা সবসময় পাওয়া যায় না তার অভাবও সে মিটিয়ে নিতে চায় নিত্যনতুন সৃষ্টির মাধ্যমে। তার মনের আকাশে-সীমাহীন ভাবনার মেঘ খেলা করে; আর সেই চিন্তার মেঘলোক থেকেই বর্ষিত হয় বৃষ্টিরূপ অভিনব সৃষ্টিধারা। শীতে সে বর্ষার কল্পনা করে; বর্ষায় মেঘমুক্ত আকাশের ছবির কথা ভাবে। তার স্মৃতিশক্তি ও সৃজনশক্তি জন্ম দিয়েছে অনন্ত কল্পনাশক্তিকে। আবার এই কল্পনা তার ইচ্ছাশক্তির অধীন, তাই মানুষ তার দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে সৃজনশীল রূপের আলোকে; চিত্রলোকের অনন্ত সৃষ্টির ঝর্ণাধারায়। রূপসৃষ্টির এই প্রেরণাই মানুষকে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকর্মে কুশলী করে তুলেছে। প্রকৃতির অনন্ত সুরের সন্ধানে সে সুরকার, রূপের সন্ধানে সে চিত্রকর, ভাস্কর, ছন্দের সন্ধানে সে আপন দেহের ভেতরেই নৃত্যের তাল ও লয়কে খুঁজে পেয়েছে; প্রকৃতির নিয়মের খোঁজে সে হয়েছে বিজ্ঞানী। এই সৃজনশীল চলার পথে আপন অস্তিত্বের উদবর্তন ঘটিয়েছে মানুষ; জন্ম দিয়েছে সভ্যতার। যে মানুষ যত বেশি সৃজনশীল সে তত বেশি সভ্য, তত বেশি জ্ঞানী, তত বেশি আনন্দময় জগতের কাছাকাছি। তাই চিত্রকলা মানুষের অন্তস্থিত সৃজনশীল প্রেরণারই ফসল।

৩। নিজের ধারণাকে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে চিত্রের ব্যবহার

কিংবা

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যম হিসেবে চিত্রের আবির্ভাব

প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টির উৎস। চিত্রকলার আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটেও মানুষের প্রয়োজন সৃষ্টির তাগিদ তৈরি করেছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞানের আদান প্রদানের প্রয়োজনে কিংবা মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে চিত্রের বিকাশ ঘটেছিল। এভাবেই চিত্র থেকে সৃষ্ট হয়েছিল চিত্রলিপির। জ্ঞানের আদান প্রদানে, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে চিত্রচর্চা ছিল অপরিহার্য। সভ্যতার কোন অজানিত ঊষালগ্নে চিত্রের আবির্ভাব হয়েছিল তা অচিন্তনীয় হলেও সভ্যতা বিকাশে চিত্রের প্রয়োজনীয়তা চির অনুভবনীয়। যে কালে ছিল না লিপি, ছিল না হয়ত সুসংবদ্ধ ভাষা, সে কালে চিত্রের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ সম্ভব হয়েছিল। চিত্রের মাধ্যমে মনের ভাব ও ধারণাকে অপরের কাছে প্রকাশ করা যেত; আর সেই ধারণা ও ভাব প্রবাহিত হয় যুগ থেকে যুগান্তরে।

এমনকি দেশ থেকে দেশান্তরে। প্রাচীন গুহাচিত্রে যে আকৃতিগুলিকে উদ্ভিদ, লতা ও পাতা নিঃসৃত রঙে চিত্রিত করেছিল প্রাচীন মানুষ, সেই চিত্র আদিম মানবগোষ্ঠীর মাঝে চেতনা ও ভাবের আদান প্রদানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। কালান্তরে চিত্রকুশলতার শ্রীবৃদ্ধিতে জ্ঞানের সেই আদান প্রদান আরও সহজতর ও ব্যাপকতর হয়েছিল।

শুধু পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের আকৃতি কিংবা কোনও ঘটনার পরম্পরা ও ধারাবাহিকতা চিত্রণেই শিল্পীর তুলি সীমাবদ্ধ থাকে নি; মানুষের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতেও চিত্রকলা বাহকের ভূমিকা পালন করেছিল। এক কথায় বলতে হয়, সভ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যে লিপির বিন্যাস সম্ভব হয়েছে, তা চিত্রকলারই ফসল। চিত্র থেকে চিত্রলিপি এবং চিত্রলিপি থেকে প্রকৃত লিপির আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে অনেক ভাষার লিপি এখনও চিত্ররূপ। যেমন চীনা ভাষার লিপি। অনেকের মতে সিন্ধু সভ্যতার লিপিও ছিল চিত্ররূপ। সেদিক বিচারে সারা বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত লিপিই চিত্রকলার সুচিন্তিত ও পরিশীলিত ফসল।

শিক্ষার অগ্রগতিতে, শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধ প্রতিষ্ঠার পথে কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও দেশের পরিচিতির পরিচায়ক হিসেবে মানচিত্রের আবির্ভাবও ছিল চিত্রকলার আর এক বিবর্তিত রূপ। মানচিত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ, ভূতল, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদীর অবস্থান চিত্রিত হয়। এই মানচিত্র মানুষের জ্ঞান বিকাশের মাধ্যম হিসেবে বহু যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বিজ্ঞানের পঠন পাঠন, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্যোর্তিবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান ও দেহতত্ত্বের জ্ঞান বিচারে চিত্রকলার অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। আলোকচিত্র আবিষ্কারের পূর্বযুগে কোনও ব্যক্তির গড়ন, মুখের আদল ও আকৃতিকে স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার একমাত্র মাধ্যম ছিল রঙ, তুলি ও ক্যানভাসে সেই ব্যক্তির চিত্র। অদ্যাবধি মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে আলোকচিত্রের অবদান বেশি দিনের নয়। ক্যামেরা আবিষ্কারের কালাবধি মানুষ নির্ভরশীল ছিল চিত্রকরের নৈপুণ্যের ওপর। তার সৃজনশীল দৃষ্টি, সৃষ্টি ও চারু কুশলতার ওপর।

৪। নান্দনিক অন্তর্দৃষ্টি

চিন্তাশীল ও সৃজনশীল মানুষ আবার সুন্দরের পূজারী। সৌন্দর্য অনুভব করে এবং অপরের কাছে নিজের সুন্দর সৃষ্টিকে তুলে ধরে আনন্দ পায়। চারুকলা ও শিল্পকলার সাধনায় অন্তর্নিহিত আছে সুন্দরের উপাসনা ও উপলব্ধি; তাই সুরের ঝংকার তৈরি করে সুরকার যেমন আনন্দ পান, ঠিক তেমনি শ্রোতাদের আনন্দিত করেন। সুযোগ্য চিত্রকরের সৃষ্টিকর্মে নিহিত থাকে নান্দনিক অন্তর্দৃষ্টি যা উপলব্ধি করে দর্শক মাত্রেই আনন্দিত ও উদ্দীপিত হন। শিল্পকর্মে বস্তুত পক্ষে স্রষ্টা থেকে দ্রষ্টা সকলের মাঝে প্রবাহিত হয় সুন্দরের উপলব্ধির এক আনন্দপ্রবাহ। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি কিন্তু শিল্পকর্মে মানুষও যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপাকৃতিকে নতুন

করে সৃষ্টি করতে পারে এই সত্যোপলব্ধিতেই নিহিত আছে আনন্দ। প্রকৃতি মানুষকে সৃজনশীল করেছে, সুন্দরকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দিয়েছে, সে কারণেই সুন্দরের সৃষ্টিকারী রূপেও প্রকৃতির কোলে মানুষের এক বিশেষ স্থান আছে। চিত্রকলা সেই সৃষ্টিরই প্রতিফলন।

চিত্রসৃষ্টির ধাপ বা চিত্রবিকাশ

চিত্র তৈরির কয়েকটি ধাপ বা চিত্রবিকাশের কয়েকটি পর্যায় আছে, কারণ সহসা কোনও চিত্র তৈরি সম্ভব নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি করলেও যে কোনও জিনিস নির্মাণে পরিকল্পনা এবং সেই কল্পনা রূপায়ণের যেমন কয়েকটি ধাপ বা স্তর থাকে চিত্র নির্মাণেরও কয়েকটি স্তর আছে। এবং সেই স্তরগুলি বহুলাংশে নিম্নরূপ প্রতীয়মান হয় ঃ

ক) চিত্রের পরাস্তর বা চিত্রকল্প[১]

খ) রূপাকৃতির স্তর[২]

গ) চিত্রবিষয়[৩]

ঘ) চিত্রোৎকর্ষ অর্থাৎ রূপ ও বিষয়ের সমন্বয় ও সংস্থিতি[৪]

চিত্রের পরাস্তর বা চিত্রকল্প ঃ চিত্রকরের মনে কোনও চিত্র সম্পর্কে যে পরিকল্পনা তা চিত্রকল্প বা চিত্রের পরাস্তর রূপে পরিচিত। তবে চিত্রকল্প বা চিত্রের পরাস্তর কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়। শিল্পীর পরিবেশ, তার সমাজচেতনা, আদর্শ, প্রকৃতির বিষয়গুলি সম্পর্কে তার ধারণা সম্মিলিত ভাবে মনের জগতে সন্নিবিষ্ট হয়ে তৈরি করে চিত্রকল্প। শিল্পীর যুগচেতনা, সমাজচেতনা, মনের ধ্যানধারণা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা– এ সব কিছুই শিল্পীর পরাস্তর তৈরিতে বিচার্য বিষয় রূপে পরিগণিত হয়। চিত্রের পরাস্তর স্পষ্ট প্রতীয়মান না হলে চিত্রবিচারও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বলা যায় শিল্পীর দেশকাল বিচার ব্যতিরেকে চিত্রের মান রূপ ও বিষয় বিচার সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্র কোনও অলৌকিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা প্রকৃতপক্ষে চিত্রকল্পের বিকাশ মাত্র। চিত্রকল্প তৈরির প্রেক্ষাপটে শিল্পীর মনোজগত বিচার্য এবং এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ –

১) শিল্পীর দেশ ও কাল অর্থাৎ শিল্পীর পরিবেশ এবং সমাজচেতনা।

২) শিল্পীর মানসজগত– তার ধ্যানধারণা বিশ্বাস ও দর্শন

৩) শিল্পীর ব্যক্তিজীবন – পরিবার ও সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত।

৪) শিল্পীর যুগ চেতনা এবং শিল্পীর ওপর যুগের প্রভাব।

৫) চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতা ও চিত্রবিকাশ।

১) *শিল্পীর দেশ ও কাল অর্থাৎ শিল্পীর পরিবেশ ও সমাজচেতনা ঃ* শিল্পীর পরিবেশ সুবৃহৎ। দেশ-কাল-সমাজ সব কিছুই শিল্পীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার শিল্পচেতনার গতিপ্রকৃতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। যিনি ইউরোপে জন্মেছেন তার ওপর ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রভাব, যিনি জাপানে জন্মেছেন-তার ওপর জাপানি চিত্রের এবং যিনি আফ্রিকায় জন্মেছেন তার ওপর নিগ্রো বা জুলুদের চিত্রকলার প্রভাব অনস্বীকার্য। কোনও জাপানি শিল্পী ইউরোপীয় নারীপুরুষের আদলে দেহসৌষ্ঠব ফুটিয়ে তোলেন না। আবার কালের প্রভাব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অজন্তার বৌদ্ধ শিল্পী তার কালের চিত্র-ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত, পেরিক্লিয়ান গ্রিসের চিত্রকর বাস্তববাদী চিত্র আঁকবেন তাই স্বাভাবিক ছিল; আবার মধ্যযুগে কোনও ইউরোপীয় শিল্পীর পক্ষে খৃস্টান চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেসাঁ চিত্রকলার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যুগ-বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করেছে। দেশ ও কালের প্রভাবের কারণেই ইউরোপীয় শিল্পীরা ভারতীয় বা জাপানি শিল্পীরা ইউরোপীয় দেহ সৌষ্ঠবের অনুকরণ করেননি। দেশ ও কালের সীমারেখা মেনেই ইউরোপীয় চিত্রকরগণ এশিয়াবাসী যিশুকে দীর্ঘাকৃতি, নীলাক্ষ এবং নর্ডিক সুপুরুষরূপেই চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দেশ ও কালের সীমারেখা বাস্তব আশ্রয়ী চিত্ররূপ ও চিত্রাদর্শকে প্রতিফলিত করে। চীন ও জাপানের ভ্রু-হীন টানা চোখ এবং স্বল্প শ্মশ্রু মুখাবয়ব সুদূর প্রাচ্যের প্রতি চিত্রে বিদ্যমান। এমনকি বৌদ্ধ চিত্রকলায় ভারতীয় প্রভাব বিষয়ের বনিয়াদ তৈরি করলেও চিত্রপরিকল্পনায় চিত্রের প্রতি খণ্ডাংশে ও সার্বিকতায় মঙ্গোলীয় দেহাকৃতি ও পরিকাঠামো স্বাতন্ত্র সুনিশ্চিত করেছে। তাছাড়া দৃশ্যপটের পরিকল্পনায় স্থানিক ও স্বদেশীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্রারোপিত হয়েছে। দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়েই বোধগম্য হয় কোন দৃশ্যপট কোন দেশের এবং কোন ভৌগোলিক পরিবেশের।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে বিদ্যমান। সেই চিত্রে সমাদৃত হয়েছে তৎকালীন সমাজের চাহিদাও। আবার আধুনিক যুগে মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পসভ্যতা, অপসৃয়মান ধর্মীয় প্রভাব, শিল্পায়ন, নগরায়ন, উৎপাদনভিত্তিক আর্থ-সামাজিক মেরুকরণ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, সামাজিক অস্থিরতা, ব্যক্তিজীবনে উৎকণ্ঠা, বিধ্বংসী যুদ্ধের আতঙ্ক প্রভৃতির ছায়াতলে যে চিত্রকলা গড়ে উঠেছে তা সততই সূচিত করেছে বিভিন্নমুখী শতধা বিভক্ত চিন্তা ও শিল্পধারার জন্ম, বৃদ্ধি ও অবক্ষয়কে। উৎকণ্ঠিত মানুষ যেমন অস্থির, তেমনি অস্থিরতায় যুগভঙ্গুর হয়েছে একালের শিল্পাদর্শগুলি। বিগত একশত বছরের চিত্রকলার ইতিহাসে রূপগত ও বিষয়গত এত বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, এত বেশি বিভাজন ও সমণ্বয় হয়েছে যা শতবর্ষ পূর্বাবধি আর কখনওই হয়নি। অনেকসময় সর্বাধুনিক শিল্পধারা আদিম শিল্পধারাকে অনুসরণ করেছে। ফলত চলমান

সভ্যতায় কোনও শিল্পাদর্শই স্থায়িত্ব লাভ করেনি। যদিও চিত্রজগতে এই পরীক্ষানিরীক্ষার গতিপথে মনোবিজ্ঞান ও সমাজচেতনাভিত্তিক এবং চারুকুশলতার নিরিখে অনেক নতুন আবিষ্কার এবং সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে। বর্তমান চিত্রকলার বহুরূপী চিত্তনিবেশের চেয়ে চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ভুলে গেলে চলবে না, আধুনিক চিত্রে স্থান পেয়েছে অপমানিত মানবতা, শৃঙ্খলিত মানুষ, নিষ্পেষিত শ্রমিক, উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে, কারাগারের বন্দী, পতিত সৈনিক, দেশছাড়া শরণার্থী, নিপীড়িত নারী, পিতৃমাতৃহীন শিশু, যুদ্ধের ধ্বংসলীলা এবং মানুষের অবদমিত মনের ছবি – যা পূর্বকালের চিত্রকলায় কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য হয়নি। বস্তুতপক্ষে এ যুগের সমাজের প্রতিচ্ছবি আধুনিক চিত্রকলায় স্থান পেয়েছে।

২) শিল্পীর মানসজগত – তার ধ্যানধারণা বিশ্বাস ও দর্শন ঃ চিত্রসৃষ্টির পরাস্তরে তাৎপর্যপূর্ণ হল শিল্পীর মনের আকাশ, ধ্যানধারণা এবং তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতপক্ষে চিত্রের রূপাকৃতি ও বিষয় বিশ্লেষণ না করলে শিল্পীর মনের আকাশ অবলোকন সম্ভব নয়। দিনের সূর্যালোকিত আকাশের চেয়ে রাত্রির আকাশ যেমন অনেক বেশি বিস্তারিত কারণ রাতের আকাশে শত সহস্র আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্ররাজি দৃশ্যমান হয়, তেমনি চিত্রের বিষয়গত ও রূপার্থক ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিল্পীর অবচেতন, মগ্নচৈতন্য বা নির্জ্ঞান স্তরের পর্যবেক্ষণও সম্ভব হয়। চিন্তাচেতনার দিক থেকে শিল্পী যে জগতের বাসিন্দা তার সৃষ্ট চিত্রে সেই জগতের আভাস বা প্রতিফলন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শিল্পীর নিজস্ব চিন্তার আকাশের ছায়াপথের গতিধারা, বিভিন্ন ভাবের ক্রমাবস্থান, সৃজনশীল চিন্তার ঘন ও হাল্কা রূপ পরিগ্রহ করা কিংবা বিলীয়মান হওয়ার ঘটনা, ভাবের আবির্ভাব বা অপসৃয়মান হওয়ার পরম্পরা, আকাশের প্রকম্পিত বাতাসের বেদনামধুর সুর ঝঙ্কার ও গতির ব্যঞ্জনা অবশ্যম্ভাবী ভাবেই তার চিত্র জগতের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ভারতীয় চিত্রকরগণ আদর্শবাদী চিত্রাদর্শে বিশ্বাস রেখে ছবি এঁকেছেন; গ্রীকরা বাস্তববাদী আবার কেউ পরাবাস্তব ছবির উপস্থাপনে ব্যস্ত থেকেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর মনের দার্শনিক দিকটি তার শিল্পের রূপ ও বিষয় নির্মাণে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

প্রাচীন পৃথিবীতে সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে শিল্পীর চিন্তা-চেতনা, তার ধর্মবিশ্বাস ও জীবন দর্শন তার তুলির বুলিতে ফুটে উঠেছে। চীন ও জাপানের শিল্পীরা তাদের বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস, ধ্যানের নীরবতা, প্রকৃতির শান্ত রূপের ধ্যান, তাও প্রকৃতিচেতনা এবং শিন্টো জীবনদর্শন তাদের চিত্রবিষয়ে প্রতিফলিত করেছেন। ইতালির রেনেসাঁ যুগের শিল্পীরা মানবতাবাদী জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কালজয়ী চিত্রে মানবের জয়গান তুলে ধরেছেন। রেনেসাঁর যিশু আধিদৈবিক কোনও শক্তির অধিকারী নন, তিনি মহান আদর্শের দিশারী রূপে এই পৃথিবীর মানুষ। তবে শিল্প সমালোচকদের একটি বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন, চিত্রশিল্পী মাত্রেই দার্শনিক চিন্তার অধিকারী নন। বহুক্ষেত্রে সর্বস্তরের চিত্রকর মৌলিক সৃষ্টির অধিকারীও নন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মধ্যযুগের খৃস্টান শিল্পীগণ একই ধারার চিত্রের অনুকরণ করেছিলেন। বৌদ্ধ গুহাচিত্রে সমস্ত শিল্পী সমানভাবে মৌলিকতার অধিকারী ছিলেন না, তারা অনেক বেশি পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক

অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। তবে নিঃসন্দেহে এই সকল অনুকরণকামী শিল্পী চিত্রকুশলতায় ছিলেন উঁচু মাপের। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, চারুকলা শিল্পী প্রায় সম্পূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক বা রূপকারের ধ্যান কলাকুশলতা নির্ভর। সেজন্য দার্শনিক চিত্রকর কিংবা চিত্রকর দার্শনিক মানবের ইতিহাসে বিরল। অবশ্য লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি চিত্রকরের মর্যাদাতিরিক্ত একজন বিজ্ঞানি, বাস্তুকার এবং লেখকের খ্যাতি অর্জনেও সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সর্বকালের অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি।

৩) *শিল্পীর ব্যক্তিজীবন – পরিবার ও সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত* ঃ কোন চিত্রকরের দ্বারা কেমন চিত্র সম্ভব হবে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও শিল্পীর ব্যক্তিজীবনকে তার শিল্পচেতনা থেকে স্বতন্ত্র রাখা অসম্ভব। শিল্পী যে পরিবারে জন্মেছেন সেই পরিবারে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক সমষ্টিগত চেতনা, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাকে প্রভাবিত করবেই। পিকাসোর বাবা ছিলেন একজন শিল্পী, ছেলে পিকাসোর বড় শিল্পী হয়ে ওঠার পথে তাঁর বাবার প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।

শিল্পকর্মে মেধাবী পিকাসো পারিবারিক সংস্কৃতির প্রভাবে পুরিপুষ্ট ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে নিরন্তর চিত্রচর্চায় নিমগ্ন দেখে একদিন রবীন্দ্রনাথও তুলি ধরেছিলেন। যামিনী রায়ের গ্রাম্য পরিবেশের প্রভাব শেষে একদিন তাকে স্বতোৎসারিতভাবে গ্রামীণ পটচিত্রের অনুকরণে এবং আধুনিকীকরণে উদ্দীপিত করেছিল। শিল্পীর জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য, ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পীর শিল্পবিষয়ের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়ক হয়ে ওঠে। অত্যন্ত দরিদ্র ও অবহেলিত ভ্যান গগ স্বাভাবিক ভাবে তাঁর চিত্রে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। আধুনিক সমাজের নিষ্ঠুরতা ও কৃত্রিমতায় হতাশাগ্রস্থ গগ্যাঁ স্থান করে নিয়েছিলেন তাহিতির আদিমদের সঙ্গে। আর তাঁর চিত্রের আদর্শ হয়ে উঠেছিল তাহিতির মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রাম। শিল্পীর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, কোনও ছোট কিংবা বড় ঘটনা শিল্পীকে শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রথে চালিত করতে পারে। যামিনী রায় তাঁর ছেলের একটি চিত্র দেখে বাঁকুড়া ও পটুয়া ঐতিহ্যে ফিরে এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ছেলের ছবিটির গুরুত্ব প্রেরণাদায়ক হিসেবে অপরিসীম।

৪) *শিল্পীর যুগ চেতনা এবং শিল্পীর ওপর যুগের প্রভাব* ঃ ইতিহাস বিচারে যে যুগ-বিভাগ আমরা করে থাকি এখানে আলোচ্য বিষয়ের সেই যুগ বিভাজনকে ধরে নেওয়া হয়নি। এখানে বিবেচিত হয়েছে শুধু চিত্রকলার যুগ। যাকে বলি যুগচেতনা (Zeitgeist) এবং যাকে বলি 'মতের প্রাধান্য' (Climate of Opinion) – এখানে যুগ বলতে চিত্রকলার জগতে তার দুটিকেই একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। যেমন গান্ধার শিল্পের যুগ, সারনাথ যুগ, The age of Cubism বা The age of Impressionism – এই ধরনের যুগচেতনা কালসাপেক্ষ নয়, শিল্পাদর্শ ও শিল্পধারা সাপেক্ষ। গান্ধার ভাস্কর্যে গ্রীক ও রোমান শিল্পশৈলী, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটেছে। গান্ধারযুগ প্রায় চারশত বছর স্থায়ী হয়েছিল। ফলে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে

এই সুদীর্ঘকালের শিল্পীরা গান্ধার শিল্পশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। পরবর্তীকালের মথুরা ও সারনাথ শিল্পশৈলী এক দীর্ঘ শিল্পযুগের সৃষ্টি করেছিল যার প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করেছিল কয়েকশত বছর। চিত্রকলার ইতিহাসে অজন্তা ও ইলোরা ভারতে ধ্রুপদী চিত্রকলার যুগবৈশিষ্ট্য তৈরি করেছিল যা শিল্পাদর্শরূপে অনুসৃত হয়েছিল শত শত বছর। যুগচেতনা বা যুগপ্রভাব শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে ঃ

ক) শিক্ষানবিশীর স্তরে যুগপ্রভাব

খ) সমাজের চাহিদায় যুগপ্রভাব

গ) নিজের অন্তঃস্থিত প্রেরণায় যুগপ্রভাব

ক) শিক্ষানবিশীর স্তরে যুগপ্রভাব ঃ

যে কোনও শিল্পী বা চিত্রকর তার শিল্পশিক্ষক এবং শিল্পী বন্ধুর শিল্পাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন এবং সেই প্রভাব চলমান যুগের প্রভাব হতে পারে। চিত্রকলার ইতিহাসে ছাত্রের ওপর শিক্ষকের প্রভাব কিংবা শিল্পীর ওপর তার যুগের প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়েছে। ইতালির রেনেসাঁ যুগে গ্রীক ও রোমান শিল্পাদর্শ নতুন যুগের শিল্পাদর্শে রূপান্তরিত হলে গুরু পেরুজীনোর চিত্রাদর্শ ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সুযোগ্য শিষ্য রাফায়েল। আবার সেই যুগে গ্রীক ভাস্কর্য ও চিত্রকলা যার হাতে নিরঙ্কুশ পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিল সেই মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য ও চিত্রকলা দুটির দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন রাফায়েল। গুরুর প্রভাবে প্রভাবিত হলেও বহু ক্ষেত্রেই উৎকর্ষতায় শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে গেছেন; পেরুজীনোর ক্ষেত্রে রাফায়েল তেমনই এক দৃষ্টান্ত, কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলোকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।

খ) সমাজের চাহিদায় যুগ প্রভাব ঃ

কোনও নির্দিষ্ট শিল্পধারা কোনও একটি সমাজে সমাদৃত হয়ে থাকলে সেই ধারায় বহু সংখ্যক চিত্রকর চিত্রানুশীলন করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া সমাজ যা চায় সেই ধারার অনুশীলনে চিত্রপট তৈরি করলে শিল্পীর জীবনধারণও সহজতর হয়। আর সময়োপযোগী শিল্প সাধনার পথে বিরূপ সমালোচনার ঝুঁকি নেই বললেই চলে। অবিশ্রুত, অপরিচিত, অপরিশীলিত এবং অপরিণত শিল্পাদর্শ যত উঁচু মানেরই হোক না কেন সেই ধারায় প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই সহজসাধ্য হয় না। এসকল ক্ষেত্রে শিল্পীর জীবদ্দশায় স্বীকৃতিও থাকে নাগালের বাইরে। নতুন শিল্পধারা প্রবর্তনের জন্য সেজান অস্বীকৃতি ও অর্থাভাবে আত্মহননের অন্ধকার পথেও গমনোদ্যোগী হয়েছিলেন। আর ভ্যান গগ সেই বেদনাদায়ক কাজটি অর্থাভাবে সম্পূর্ণ করেছিলেন। অনেকে বলেন যামিনী রায় চিত্রের নতুন পথের দিশারী হয়ে অর্থোপার্জন করেছিলেন। সত্যি বলতে কি যামিনী রায় কোনও নতুন শিল্পাদর্শের পথ আবিষ্কার করেননি, বরং বহু যুগ লালিত এবং পরিপোষিত বাংলার গ্রামীণ

220120 26 JUL 2010

LIBRARY NBU. DARJEELING

চিত্রের ঐতিহ্যকে উঁচু স্তরের চিত্র কুশলতায় আভিজাত্যময় করে তুলেছিলেন। সে দিক বিচারে বাংলার গ্রামীণ চিত্র এবং সমাজের প্রভাবকে তিনি বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবং তা সমাজের বৃহদংশের চাহিদাকে শিরোধার্য করে নিয়েই সম্ভব হয়েছিল।

তবে আগের যুগে চিত্রজগতে সামাজিক চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হত শিল্প পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল বিরল। ভারতে মৌর্য যুগে ভাস্কর্য সম্পূর্ণভাবে মহামতি অশোকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের পরিপোষক ছিল। গান্ধার ও মথুরা শিল্প রাজপৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত ছিল না। গুপ্ত যুগে মথুরা ও সারনাথের ভাস্কর্য এবং অজন্তার গুহাচিত্র কতটুকু সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্ট হয়েছিল এবং কতটুকু বৌদ্ধ মঠের পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে এমন ভাবা অসমীচীন নয় যে, বৌদ্ধ যুগে সমাজের সাধারণ মানুষ বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিল। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বণিক সমাজ জৈন ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পুষ্টিবিধান করেছেন তাদের নিরন্তর চাহিদার মাধ্যমে। বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রের যুগে সাধারণ মানুষের কাছে বৌদ্ধ দেবদেবী ও চিত্রকলা কিংবা হিন্দুদের কাছে হিন্দু দেবদেবী ও চিত্রকলা অবশ্যই ভক্তি ও সমাদর লাভ করেছিল। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রতি যুগের শিল্প ও চিত্রকলা সেই যুগের শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা অংশত সত্য। সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতার যে কথা মার্ক্সবাদীরা বলে থাকেন তা পূর্ণমাত্রায় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে পালন করা হয়েছে কি না তা বলা কঠিন। তবে বর্তমান যুগে কিয়দংশে অশ্লীল চিত্রকলা ব্যতীত সমাজের নির্যাতিত ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রাম অনেক চিত্রকরের তুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; এবং সেক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর শ্রেণির মৌল আবেদন শিল্পীর চেতনাকে নাড়া দিয়েছে – এই সত্য চিত্র সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।

ঘ) নিজের অন্তঃস্থিত প্রেরণায় যুগপ্রভাব ঃ

প্রতি যুগের শিল্পভাবনা শিক্ষকের প্রভাব কিংবা সমাজের চাহিদায় শিল্পীকে উদ্দীপিত করতে পারে; ঠিক তেমনি শিল্পী স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নিজেও যুগ চেতনায় সমাচ্ছন্ন হয়ে সেই যুগের শিল্পাদর্শকে আরও বিকশিত করে তুলতে পারেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণের শিল্পীগণ বিশেষ করে লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, তিসিয়ান প্রমুখ সে যুগের মানবতাবাদী শিল্পীরা যুগ চেতনাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতায় বেঙ্গল স্কুল অব আর্টের শিল্পীরা অন্তঃস্থিত প্রেরণায় বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে অজন্তাস্থিত ভারতের ধ্রুপদী চিত্রকলাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার, মুকুল দে, নন্দলাল বসু প্রমুখদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঙ) চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতা ও চিত্রবিকাশ ঃ

স্বাধীন শিল্পীর সংখ্যা পৃথিবীতে বিরল। তাদের চিত্রকল্প এবং সৃষ্ট চিত্র নতুন শিল্পাদর্শের সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে, তারাই সৃষ্টি করেন নতুন যুগ চেতনা। পল সেজান এমনই স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়ে জন্ম দিয়েছিলেন ইমপ্রেশনিজম থেকে এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকলার। কিউবিজমের সুপ্ত সূচনাও হয়েছিল তাঁর হাতে, যদিও তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল পিকাসোর সৃষ্টিতে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ মগ্ন চৈতন্যোৎসারিত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এক নতুন চিত্ররূপ। যা কোনও কালে কোনও যুগের চিত্রকল্পের সদৃশ কখনওই নয়। বস্তুতপক্ষে শিল্পীর স্বাধীনতা গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায় আর তার ফলে নতুন পথে ও নতুন ধারায় বিবর্তিত হয় চিত্রকলা।

খ) রূপাকৃতির স্তর ঃ

যে কোনও আকৃতি বা রূপ চিত্র নয়। একমাত্র অর্থবহ আকৃতি বা রূপই চিত্রবস্তুরূপে পরিগণিত। কোনও চিত্রকে অর্থবহ হয়ে উঠতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে অর্থাৎ যে জিনিসের ছবি তার সঙ্গে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রয়োজন। ছবিটি কোনও কল্পিত বিষয়ের হলে তার মধ্যে কোনও অর্থ সন্নিবিষ্ট থাকতে হবে। প্রকৃতির কোনও রূপের সঙ্গে মিল নেই, ভাবের কোনও ছাপ নেই, কোনও নিগূঢ়ার্থ নেই, এমন কোনও জিনিস রঙের ছটা মাত্র, চিত্র নয়। কুকুরের ছবি আঁকলে তা বাস্তবে কুকুরসদৃশ হবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের আকৃতির কমবেশি হতে পারে, তাই বলে তা বৃক্ষরূপ হবে না। সিংহ অশ্ব হবে না, পাখি কুমীর হবে না – রূপাকৃতির স্তরে এই জিনিসগুলি বাস্তবানুগ রূপ লাভ করবে চিত্রকরের তুলিতে তাই প্রত্যাশিত। তবে কল্পনাপ্রসূত কোনও রূপ অর্থবহ হলে, আপাতদৃষ্টিতে তা অবাস্তব হলেও, চিত্রসত্য তাতে নিহিত থাকতে পারে। সেই চিত্র প্রতীকধর্মী হতে পারে আবার প্রতীকের গভীর অর্থ থাকতে পারে। যেমন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। কখনও কোনও কল্পনা বাস্তবাতিরিক্ত হলেও তাতে শিল্পসত্য থাকতেই পারে; যেমন একটি পাখি একটি হাতিকে গিলে খাচ্ছে। এমন পক্ষীদানব বাস্তবে না থাকলেও, শিল্পীর কল্পনায় আসা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে পাখি ও হাতি প্রতীক রূপ হতে পারে। শিল্পী এই রূপ প্রতীকে কোনও গভীর অর্থের ইঙ্গিত করে থাকতে পারেন। বিমূর্ত চিত্রকলা ও সুররিয়ালিস্ট চিত্রকলা বাস্তবধর্মী না হলেও গভীরভাবে অর্থবহ; কারণ এরূপ চিত্র চেতনার অজ্ঞাত ও অজানিত দিকটির প্রতীক হয়ে গভীর অর্থ বহন করে। অপরদিকে ভারতীয় আদর্শবাদী চিত্রকলায় বাস্তবতা মডেল হতে পারেনি। মানুষ আকৃতিতে কোনও নির্দিষ্ট মানুষের রূপ মডেল না হয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপ বিন্যাসে প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের রূপকে সাদৃশ্য স্বরূপ মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

গ) চিত্র বিষয় ঃ

চিত্রের রূপের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট থাকে চিত্রের বিষয় ও অর্থ। যেমন অজন্তা চিত্রাবলীতে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাহিনী তুলে ধরা আছে। রোমের সিসতিন চ্যাপেলের ছাদে খৃস্টধর্ম এবং যিশুর জীবনকেন্দ্রিক ও বিষয়কেন্দ্রিক চিত্র চিত্রিত হয়েছে। মুঘলচিত্রে দরবারি কাহিনী স্থান পেয়েছে। চীন-জাপানের চিত্র বহুলাংশে বুদ্ধের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয়কে তুলে ধরেছে। প্রকৃতপক্ষে চিত্ররূপ বিষয় ব্যতীত অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না আবার রূপ ছাড়া বিষয় বিকশিত হতে পারে না।

ঘ) চিত্রোৎকর্ষ অথবা রূপ ও বিষয়ের সমন্বয় ও সংস্থিতি ঃ

চিত্ররূপ এবং চিত্রবিষয়ের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় ও সংস্থিতি স্থাপিত হলে চিত্র উৎকর্ষতা লাভ করে। চিত্রোৎকর্ষ বলতে বোঝায় যেখানে রূপের দিক থেকে চিত্র নিখুঁত ও মনোমুগ্ধকর এবং বিষয়ের দিক থেকে রূপের সঙ্গে সমন্বয়কেন্দ্রিক, ভাবোদ্রেককারী এবং আকর্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির 'ভার্জিন অব দি রক' এবং রাফায়েলের 'ম্যাডোনা'। অজন্তা চিত্রেও ঘটনা বিন্যাসে এমন সব নিখুঁত নাট্যরূপ চিত্রিত হয়েছে যা অনবদ্য ও আকর্ষণীয়। রূপ ও বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে চিত্র উৎকর্ষ লাভ করে না। প্রকৃত অর্থে চিত্রকল্পে রূপ ও বিষয় সমন্বিত থাকে; কিন্তু চিত্রকরের তুলিতে যে ছবি বেরিয়ে আসে সেখানে রূপ, ভাব ও অর্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটলে তবেই উৎকর্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে রঙের সঙ্গে ভাবের অন্বিতি এবং ভাবের সঙ্গে ভঙ্গির অন্বিতি একান্ত আবশ্যক। চিত্র বিষয়টির যা অর্থ চিত্রের চরিত্র বিন্যাসে সেই ভঙ্গি সুস্পষ্ট না হলে ভাবের বিয়োগ ঘটে; উৎকর্ষে ব্যাঘাত ঘটে এবং চিত্র নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় বলা যায় একমাত্র যোগ্য শিল্পীর হাতেই চিত্র উৎকর্ষতা লাভ করে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা ঃ

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী; রূপা অ্যান্ড কোং, ১৯৮৩; পৃঃ ১০৩-১১৩, ২৭০-২৭৮

২। ঐ, পৃঃ ৭৪-৮৮, ২২২-২২৫, ২৭০-২৭৮

৩। নন্দলাল বসু, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯২; পৃঃ ৩৪-৩৮

৪। ঐ, পৃঃ ২৯৯-৩১০

চিত্রকলার স্বরূপ বিচার

বিশ্বচিত্রকলার বিপুল পরিধি, ব্যাপ্তি ও গভীরতার নিরিখে চিত্রের স্বরূপ এবং বিভাজন সাধ্যাতীত মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে চিত্রের দুটি দিক– (ক) রূপগত (খ) বিষয়গত। বিষয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী রূপের ভিন্নতা ঘটে; আবার নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও রূপের বৈচিত্র্য আনয়ন করে। গ্রীসের 'বাস্তববাদী' (Realistic Art) চিত্রকলা ভারতীয় আদর্শাশ্রয়ী (Idealistic Art) চিত্রকলা রূপের দিক থেকে স্বতন্ত্র। এই নিবন্ধে রূপার্থক ও বিষয়াত্মক উভয় দিক বিচারেই চিত্রকলার স্বরূপ ও বিভাজন সন্নিবেশিত হল নিম্নরূপে ঃ

১। বাস্তবাশ্রয়ী চিত্রকলা

২। ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা ধর্মাশ্রয়ী চিত্রকলা

৩। আদর্শাশ্রয়ী চিত্রকলা

৪। তত্ত্বাশ্রয়ী চিত্রকলা

৫। তথ্যাশ্রয়ী চিত্রকলা

৬। প্রতীকাশ্রয়ী চিত্রকলা

৭। স্বপ্নাশ্রয়ী চিত্রকলা

৮। নির্জ্ঞান-চেতনাশ্রয়ী চিত্রকলা

৯। কল্পনাশ্রয়ী চিত্রকলা

১০। ভাবাশ্রয়ী চিত্রকলা

১১। স্মৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকলা

১২। অলীকাশ্রয়ী চিত্রকলা

১। বাস্তবাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

যে চিত্রের মাধ্যমে প্রকৃতি জীবন ও সমাজের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরা হয় এবং যা বিষয়গত ও রূপগত দুই দিক বিচারে বস্তুনির্ভর তাকেই বাস্তবাশ্রয়ী চিত্র বলে আখ্যায়িত করা যায়। যা সত্যিকারের ঘটে বলে মানুষ জানে এবং যে ক্ষেত্রে কোনও কল্পনা, তত্ত্ব বা প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হয় না বস্তুতপক্ষে যা আছে তাকে কেন্দ্র করে যে চিত্র তাই বাস্তবাশ্রয়ী। আদিম মানবের চিত্রকলা, যেমন গুহাচিত্র, জীবজন্তু ও শিকারের চিত্র তার অধিকাংশই বাস্তবাশ্রয়ী। তথ্যাশ্রয়ী চিত্রও প্রকৃতপক্ষে বাস্তবাশ্রয়ী, কারণ এই চিত্র ইতিহাসনির্ভর। বাস্তবাশ্রয়ী চিত্রের উপাদানে কল্পনা, অলীকত্ব, আদর্শগত রূপদান কিংবা ব্যক্তিগত ভাবের প্রভাব সম্পূর্ণ

অনুপস্থিত। মানচিত্র, ভূমিচিত্র, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিত্র রূঢ় বাস্তবাশ্রয়ী। তবে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যাকে Realistic চিত্র বলা হয় তার সবকিছুই বহির্বাস্তবাশ্রয়ী নয়। চিত্রকলার আকৃতি ও রূপ বিন্যাসের প্রেক্ষিতে চিত্রটি বাস্তবানুগ হতে পারে, কিন্তু সেই বাস্তব রূপ বিন্যাসের মাধ্যমেও এমন ঘটনাকে বিষয়ীভূত করা হয়ে থাকতে পারে যার সবটুকুই ধর্মীয় বিশ্বাস নির্ভর কিংবা কল্পনাপ্রসূত। সেদিক বিচারে রূপগত এবং বিষয়গত দু'দিক থেকে বাস্তবতাকেন্দ্রিক হলেই একমাত্র সেই চিত্রকে বাস্তবাশ্রয়ী বলা যায়। বাস্তবাশ্রয়ী চিত্রে কল্পিত কাহিনী ও অলীক ভাবাবেগের স্থান নেই। আধুনিক চিত্রকলায় সাধারণ কোনও মানুষের কিংবা পরিবারের ছবি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি কিংবা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের ছবি বিষয়ের দিক থেকে বাস্তবাশ্রয়ী কিন্তু সেক্ষেত্রেই দৃশ্যের প্রেক্ষাপট কল্পিত হতে পারে। এতৎসত্ত্বেও আপেক্ষিক ভাবে ওই ধরনের চিত্রকে বাস্ত বাশ্রয়ী বলা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে এ সকল ক্ষেত্রে শিল্পীর উদ্দেশ্য বাস্তব ঘটনাকে বর্ণিত করা।

এই নিবন্ধে 'বাস্তব চিত্র' এই যৌগ শব্দ ব্যবহার না করে 'বাস্তবাশ্রয়ী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতাকে আশ্রয় করে চিত্র আঁকা যায়, কিন্তু চিত্রে সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। পূর্ণ বাস্তব চিত্র সম্ভব নয়। বাস্তবের নকল বা অনুকরণ কোনওটিই পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্ভব নয়। প্লেটো শিল্পীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে তিনি বাস্তবকে বা প্রকৃতিকে নকল করার ব্যর্থ প্রয়াসে ব্রতী হন। চিত্রসমালোচক নেলসন গুডম্যান চিত্রের বাস্তবতাকে আরও শক্তিশালী আঘাত হেনেছেন ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে। তাঁর মতে বাস্তব ছবি বলতে শিল্পী বড় জোর এমন কোনও ছবি আঁকতে পারেন যা বাস্তবের কোনও কিছুর সাদৃশ্যমূলক[১]। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, ডিউক অব ওয়েলিংটনের ছবি অঙ্কন সম্ভব নয়, তবে এমন ছবি আঁকা যায়, যা ডিউক অব ওয়েলিংটনের আকৃতির সাদৃশ্য বহন করে। এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে, ছবিটি ডিউকের আকৃতির সাদৃশ্যমূলক, কিন্তু ডিউক ছবিটির সাদৃশ্যমূলক নন। এর অর্থ হল, কৃত্রিম ছবি মূল আকৃতির সাদৃশ্য বহন করতে পারে, কিন্তু মূল আকৃতি, এক্ষেত্রে ডিউক অব ওয়েলিংটনের আকৃতি, কৃত্রিম হতে পারে না। অর্থাৎ মূল কখনও কৃত্রিমের নকল হতে পারে না।

গুডম্যানের মতে বাস্তব চিত্র অসম্ভব। কোনও মানুষের বহিরঙ্গের নকল যদিও চিত্রে কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত হয়, কিন্তু সেই চিত্রে মানুষটির মনের জগত, তার চিন্তাভাবনা, তিনি কী করেন, তিনি পণ্ডিত না মূর্খ, তার জীবনধারা– এসবের কিছুই জানা যাবে না। যদি দেহাকৃতিতে মনের চিত্র প্রতিফলিত করতে গিয়ে কোনও শিল্পী চিত্রের মুখাবয়ব এবং বহিরাকৃতিতে বিকৃতি ঘটান তবে সেক্ষেত্রে অবয়ব প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দিক বিচারে তথাকথিত বাস্তব চিত্রকে গুডম্যান বাস্তবতার নিরিখে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[২] অর্থাৎ একই মানুষের একশোটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করলেও প্রতিটি চিত্রই পরস্পরের প্রেক্ষিতে আপেক্ষিক; আবার কোনও চিত্রই সত্যিকারের বাস্তবের নকল নয়।

গুডম্যানের বক্তব্য এবং তাঁর যুক্তির বিন্যাসকে নস্যাৎ করার দুর্বুদ্ধিকে প্রশ্রয় না দেওয়াটাই সমীচীন। কিন্তু গুডম্যান যা বলেছেন তা স্বীকার করে নিয়েও চিত্রের বাহ্যত বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। শিল্পী কোনও একটি নির্দিষ্ট গরুর ছবি অঙ্কন না করে বাস্তবোচিত একটি গরুর আকৃতি অঙ্কন করলে গরু যে দেখতে সাধারণত চিত্রের গরুটির মতো তাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এককথায় চিত্রের মাধ্যমে বাস্তব অনুভূতি উৎপাদন করা সম্ভব বলেই চিত্রের বাস্তবতার সম্ভাব্যতাও অনস্বীকার্য। তাই এক্ষেত্রে বাস্তবোচিত অনুভূতিই গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রধান কারণ গুডম্যানের মতো সমালোচকেরা চিত্রের বাস্তবতাকে আঘাত হানতে গিয়ে বলেছেন যে চিত্রকে দেখতে বাস্তবের মতো করে তুলতে গিয়ে শিল্পী পরিপ্রেক্ষিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরিপ্রেক্ষিত বস্তুত আলোছায়ার ছলনা ছাড়া কিছুই নয়। আসলে চিত্রে দূর-নিকট জ্ঞান প্রদান এবং চিত্রে বিন্যস্ত বিষয়ে পারস্পরিক দূরত্ব পরিজ্ঞাপন পরিপ্রেক্ষিতের কাজ। এই পরিপ্রেক্ষিত আলোছায়ার খেলা যা চিত্রে শেড ও রঙের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। তাই পরিপ্রেক্ষিত রঙ ও শেডের মাধ্যমে এক ছলনার উপস্থাপন মাত্র; বাস্তব নয়। তাই বাস্তবচিত্র কথাটি একমাত্র দৃষ্টি-সংবেদনে অনুভূতির ক্ষেত্রেই সমীচিন। পরিপ্রেক্ষিত বাস্তব বিচারে মরিচীকা সদৃশ; সেখানে বাস্তবের কোনও অস্তিত্ব নেই; রঙের খেলা আছে মাত্র। তবে পরিপ্রেক্ষিত বাস্তবের প্রেক্ষিতে কলাসত্যকে তুলে ধরে।

২। ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা ধর্মাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

যখন কোনও চিত্রধারা রূপগত ও বিষয়গত দুদিক বিচারে যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত ভাবে কিংবা অলক্ষনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে সে জাতীয় চিত্রকলাকে এই সম্পর্কে ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিত্রকলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অজন্তা চিত্রশৈলী, নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও চিত্রাদর্শ কয়েকশত বর্ষ যাবৎ ধারাবাহিক ভাবে চিত্রিত হয়েছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা। তখন সেই চিত্রধারা শিল্পীদের পরম্পরা এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল। আবার এদেশে কালে পটের চিত্র বা তথাকথিত পটুয়াচিত্র, মধ্যযুগের ইউরোপে খৃস্টান চিত্রকলা এবং মোগল দরবারে দরবারি চিত্রকলা ঐতিহ্যাশ্রয়ী ছিল সন্দেহ নেই। তিব্বতের বৌদ্ধ চিত্রকলা ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে কারণ তিব্বতীয় চিত্রধারা বহুযুগ ধরে বিষয় এবং রূপ বিচারে অপরিবর্তিত আছে।

গুরুশিষ্য পরম্পরা অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিব্বতীয় চিত্রকলা গতিশীল আছে। এই ধরনের শিল্পধারায় শিল্পীর স্বাধীনতা ও ভাবের চেয়ে পরম্পরা, ঐতিহ্য এবং নির্দিষ্ট ধারার শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ সর্বাংশে গুরুত্ব পায়।

৩। আদর্শাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

যখন চিত্রে চিত্রবিষয়ে দেশ ও কাল ভিত্তিক বাস্তব রূপাকৃতির অবলুপ্তি ঘটে এবং বিকশিত হয় এক উদ্দিষ্ট বা উদ্দেশ্য সাপেক্ষ রূপাকৃতি এবং প্রতীকাশ্রয়ী বিষয়াদর্শ তখন সেই চিত্রকে আদর্শাশ্রয়ী চিত্র বলে অভিহিত করা যায়। ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রকলা আদর্শাশ্রয়ী। এরূপ চিত্রকলায় দেবদেবীর আকৃতি মানুষের আকৃতির অনুকরণ নয়। একটি নিহিত তত্ত্ব ও আদর্শকে ফুটিয়ে তোলার জন্য দেবদেবীর রূপ হয় প্রতীকী। আবার মানুষের আকৃতিও বাস্তবে ঠিক যা চিত্রে তার অনুকরণ হয় না। অনুসরণ করা হয় প্রকৃতিনির্ভর মানুষের রূপ কেমন হলে আরও বেশি সুন্দর হয় সেই আদর্শকে। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ষড়ঙ্গের অনুসরণ চিত্রকে এক পরাবাস্তব আদর্শের অবলম্বনে প্রতিফলিত করেছে। এক্ষেত্রে দেবদেবী, যক্ষ-যক্ষী, কিন্নর-কিন্নরী, মানব-মানবী সকলের আকৃতিই আদর্শ ও প্রকৃতিনির্ভর হয়েও বাস্তবাতীত। প্রকৃতিনির্ভর এই অর্থে যে চিত্রাদর্শের নান্দনিক ও প্রায়োগিক দিকগুলি প্রকৃতির রূপাদর্শ ভিত্তিক। যেমন পুঁটিমাছের মতো অথবা ধনুরাকৃতির চোখ, শুকচঞ্চু বা তিলপুষ্পের মতো নাক, পানের আকৃতি ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডল, সিংহের মতো কটি, ষাঁড়ের মস্তকের মতো পুরুষের বক্ষ, উলটো কদলী কাণ্ডের মতো নারী উরুদেশ, দেবদেবীর ক্ষেত্রে ত্রি-নয়ন এবং আজানুলম্বিত বাহু নিঃসন্দেহে মানুষের বাস্তব আকৃতির অনুকরণে নয়। এখানে বাস্তবাকৃতি ঠিক যা, চিত্ররূপ ঠিক তা নয়। অনুসরণ করা হয়েছে প্রকৃতির কিছু সাদৃশ্যকে যা মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিরূপ মাত্র। তবে একথা সত্য মানুষের মুখমণ্ডল, নাক, চুল, উরুদেশ, চোখের গঠন তার কোনওটিরই কোনও স্বতঃসিদ্ধ মডেল বা সার্বিক রূপ নেই। চতুষ্কোণাকৃতি, লম্বাটে, গোলাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের মুখমণ্ডল হতে পারে। সেক্ষেত্রে উল্টো ডিম্বাকৃতির মুখমণ্ডল, তিলপুষ্প নাসা, সিংহকটি, বৃষমস্তক-বক্ষ, কদলীকাণ্ডাকৃতি উরুদেশ প্রভৃতি রূপের আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতেই পারে। বিভিন্ন আকৃতির নাক যথা চ্যাপ্টা নাক, মোটা নাক, অতি উঁচু নাক প্রভৃতি রূপ নয় একমাত্র তিলপুষ্প নাসা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে শুকচঞ্চুনাসা গ্রহণযোগ্য হয়েছে।[৩]

প্রাচীন ভারত এই রূপের আদর্শকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান আকর্ষণীয় এবং রূপস্নিগ্ধ অবস্থাকে তুলে ধরেছে । বার্ধক্যের ছাপ বিরহিত চিরযৌবনই চিত্রালম্ব ও চিত্রাদর্শ হয়ে উঠেছে। তাই ভারতীয় চিত্রে দেবদেবীর কোনও বার্ধক্যের প্রতিফলন নেই। সারনাথ ও মথুরায় বুদ্ধের কোনও বার্ধক্যজনিত মূর্তি কিম্বা অজন্তায় কোনও জরাগ্রস্ত বুদ্ধের চিত্র নেই। অশীতিপর বুদ্ধ সেখানে চিরযৌবন ও রূপের অধিকারী। ইউরোপী চিত্রেও যিশু ও সন্তদের ঊর্ধ্বগামী দৃষ্টিতে এক স্বর্গীয় ও স্বর্গমুখী ধর্মাদর্শ বিকশিত হয়েছে। চীন ও জাপানি চিত্রে নীরব প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুভব ও উপলব্ধি করার প্রয়াসেও প্রকৃতিস্থিত এক নিহিত রূপাদর্শের অনুসন্ধানের ছাপ পড়েছে। প্রকৃতির রূপে মানুষের ধ্যানমগ্নতা সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে সুদূর প্রাচ্যের চিত্রকলায়। ভারতের আদর্শবাদী ও প্রকৃতিবাদী চিত্রকলা, ইউরোপের গগনমুখী যিশুর দৃষ্টভঙ্গিযুক্ত চিত্রকলা, সুদূর প্রাচ্যের চিত্রে প্রকৃতির ধ্যান ও নীরবতা– সবই আদর্শাশ্রয়ী চিত্রের উদাহরণ।

৪। তত্ত্বাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

যখন চিত্রের বিষয়বস্তু ও রূপ তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্ণীত ও চিত্রিত হয় এবং যেখানে শিল্পীর নিজস্ব ধ্যানধারণা ও সৌন্দর্যচেতনা স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না, সেই ধরনের চিত্রকে তত্ত্বাশ্রয়ী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পকলায় তত্ত্বের বহুল ব্যবহার ভাস্কর্যে বেশি লক্ষ্যণীয়। এবং ভাস্কর্যের অনুকরণে চিত্রিত ছবিসমূহ নিঃসন্দেহে তত্ত্বাশ্রয়ী। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গে দৈহিক পরিকাঠামো অনুযায়ী তৈরি করা হয় কিংবা চিত্রিত হয়। ভাব ফুটিয়ে তোলা হয় অসংখ্য মুদ্রায় এবং মুদ্রাগুলি শিল্পশাস্ত্রে নির্ণীত আছে। শিল্পীকে শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করতে হয়। বিভিন্ন দেবদেবীর আকৃতি, দৈর্ঘ্য, গায়ের রঙ, বাহন এবং হাতের যন্ত্র ও অস্ত্রাদি শিল্পশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। শিল্পীর পক্ষে শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ বা তাত্ত্বিক অনুশাসন অমান্য করা সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক নির্দেশ মান্য করে শিল্পীর স্বাধীন নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। বাঁধনহীন স্বাধীনতার কোনও সুযোগ নেই। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পশাস্ত্রের তাত্ত্বিক নির্দেশের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

শুধু হিন্দু দেবদেবীর চিত্র বা ভাস্কর্য নয়, তিব্বতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ চিত্রকলাও তত্ত্বাশ্রয়ী। ধর্মীয় নিয়ম মেনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে তিব্বতী চিত্রকলা চিত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন আকৃতির মণ্ডল, 'ইয়াবুম্' (বুদ্ধ ও বুদ্ধের শক্তিরূপিনী ও জ্ঞানরূপিনী নারী মূর্তি), 'চেনরেজিগ' (অবলোকিতেশ্বর), 'গুরু রিম্‌পোচে' (পদ্মসম্ভাব), 'গুরু দোরজেট্রোলো (বজ্রধারী ভীষণাকৃতি গুরু পদ্মসম্ভাব) প্রভৃতি চিত্র তত্ত্বানুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর চিত্রাবলী তথ্যাশ্রয়ী নয় কিন্তু তত্ত্বাশ্রয়ী। কারণ পৌরাণিক কাহিনীর বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয় তবে তা ধর্মীয় তত্ত্বভিত্তিক অবশ্যই। এই পার্থক্য থেকে তত্ত্বাশ্রয়ী এবং তথ্যাশ্রয়ী চিত্রকলার বিভাজনরেখা সুস্পষ্ট।

৫। তথ্যাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

বিষয়গত দিক থেকে যে সকল চিত্রকলা ঐতিহাসিক কোনও ঘটনাকে তুলে ধরে কিংবা বাস্তব ঘটনাকেন্দ্রিক কিংবা যে চিত্রকলা কোনও ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপঞ্জীভিত্তিক, এককথায় যা পরিপূর্ণ বা আংশিক হলেও সত্য তাকে তথ্যাশ্রয়ী চিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যিশুর ক্রশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনী সম্বলিত চিত্র, বুদ্ধের জীবনের ঘটনাপঞ্জী সম্বলিত চিত্র এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিত্র তথ্যাশ্রয়ী চিত্রের পর্যায়ভুক্ত। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চিত্র বহুলাংশে কল্পনা ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে বলে একে আংশিক তথ্যাশ্রয়ী চিত্র বলা যায়। তথ্যের বা সত্য ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে কল্পনা শিল্পীকে শূন্যতাপূরণে সাহায্য করেছে এবং যুগে যুগে তথ্যাশ্রয়ী চিত্রাঙ্কনরত শিল্পীগণ কল্পনা বিবর্জিত হয়ে কোনও চিত্রাঙ্কনে সক্ষম হননি। তথাপি এ সত্য অনস্বীকার্য যে তথ্যের বাধ্যবাধকতা থেকে শিল্পী নিজেকে অপরিহার্যভাবেই মুক্ত করতে

পারেননি। তবে কোনও চিত্রই সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক সম্ভব নয় বলেই একে তথ্যাশ্রয়ী চিত্র বলা হয়েছে। এই চিত্র তথ্যোৎসারিত নয় কিন্তু তথ্যাশ্রয়ী।

বিষয়ের দিক থেকে যে চিত্র তথ্যাশ্রয়ী রূপাকৃতির বিচারে তা সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর না-ও হতে পারে। বুদ্ধের জীবনীমূলক কোনও সত্য ঘটনা চিত্রায়িত করতে গিয়ে শিল্পী বুদ্ধের আকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে না-ও ধরতে পারেন। বুদ্ধ দেখতে কেমন ছিলেন তার নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বর্ণনার অভাবেও শিল্পী এ কাজে অসমর্থ হতে পারেন। তবে শিল্পীর ইতিহাস চেতনা ও ধ্যান অনুযায়ী বুদ্ধের আকৃতিকে যেটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তার ভিত্তিতেও চিত্রটিকে তথ্যাশ্রয়ী বলে অভিহিত করা অসমীচীন হবে না।

৬। প্রতীকাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

প্রতীক মাধ্যম চিত্রাঙ্কন এবং প্রতীকের সাহায্যে চিত্র-বিষয়ের বিকাশ পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় অতি প্রাচীনকাল থেকে হয়ে এসেছে। প্রাচীন সম্মোহন চিত্র, ম্যাজিক আর্ট, লিপির অঙ্কন যার লক্ষ্য ছিল শব্দকে রূপদান বা প্রতীক আকৃতি প্রদান– প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যম বিশ্লেষণে চিত্র-প্রতীকের বিশ্বজনীনতা প্রমাণিত হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশে ধারণার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে ধারণা ও ভাবের জটিলতা সুস্পষ্ট। প্রতীকের বিচিত্র ব্যবহার এবং ভাব সূক্ষ্মতার রূপার্থক বাহক হিসেবে প্রতীকের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ নিম্নে আলোচিত হয়েছে। প্রতীকাশ্রয়ী চিত্র অনুধাবনে প্রতীকের বিভাগগুলি অনুধাবনযোগ্য ঃ

ক) জ্ঞান প্রতীক

খ) মনোপ্রতীক

গ) দেব প্রতীক

ঘ) স্বপ্ন প্রতীক

ক) জ্ঞানপ্রতীক ঃ

যে চিত্রপ্রতীকের মাধ্যমে প্রতীকের চরিত্রভিত্তিক এবং প্রতীকারোপিত কোনও নিগূঢ় অর্থকে মুখ্যরূপে বোঝায় এবং তা আপাতগ্রাহ্য দৃশ্যরূপার্থ গৌণতায় পর্যবসিত হয়, সেক্ষেত্রে সেই প্রতীককে জ্ঞানপ্রতীক বলা হয়। ভারতীয় চিত্রকলায় পদ্ম, হংস, জল, জলঘট, পূর্ণকুম্ভ, অস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানপ্রতীক। অন্য সকল ধর্মেও এই ধরনের প্রতীকের ব্যবহার আছে যেমন, খৃস্টানধর্মে আদম ও ইভের কাহিনীতে নিষিদ্ধ বৃক্ষ, সর্প ও আপেল। এই প্রতীকগুলির অর্থ নিম্নে অতি সংক্ষেপে আলোচিত হল।

পদ্ম ঃ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় চিন্তায় ও সংস্কৃতিতে পদ্মের স্থান অনস্বীকার্য। ফলত চিত্রকলাতেও পদ্ম এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পদ্মচরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে তার বাহ্য রূপাতিরিক্ত অর্থ ও রহস্য।[৪] পদ্মচরিত্র মানুষের চরিত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে যদি পদ্মচরিত্র অনুধাবিত হয়। পদ্মের মৃণাল তার

মূল থেকে উত্থিত হয়ে গভীর জলস্তর ভেদ করে স্ফুরিত হয় আলোর জগতে ফুলে ও পাতায়। আলো এক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রতীক। পদ্ম অন্ধকাররূপ অজ্ঞানতা থেকে নিজেকে দূরে রাখে। সায়াহ্ন আগমনে সে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মস্থিত করে রাখে; আপন পাপড়ি দিয়ে নিজেকে ঢেকে দেয় অর্থাৎ আপন কোরকে হয় ধ্যানমগ্ন। বিভাবরী শেষে ঊষার আগমনে ভাঙে তার ধ্যান; খোলে তার পাপড়ি সকল উন্মীলিত চোখের পাতার মতো সূর্যালোকের ঝর্ণাধারায়। পদ্মচরিত্র মানুষকে শিক্ষা দেয় কী করে অন্ধকাররূপ অজ্ঞানতা ত্যাগ করে আলোরূপ জ্ঞানের জগতে পাড়ি জমাতে হয়। যিনি পদ্মচরিত্র অনুসরণ করেন তিনি সত্যিকারের অনুসরণ করতে পারেন মৈত্রীর বাণী– অসতো মা সত্যাগময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময়ো মৃত্যুর্মামৃতগময়ো।

পদ্মের মৃণালে রয়েছে অসংখ্য কণ্টক, যা পদ্ম ও তার মৃণালকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। মৃণালের মতোই প্রতিটি মানুষকে স্ব-প্রতিরক্ষায় বিশ্বাসী হতে হবে। পদ্মে রয়েছে চারটি রং; মৃণালের রঙ সবুজ যা জীবনের প্রতীক; পদ্ম পাপড়িতে দুটি রঙ লাল ও সাদা – লাল উদীয়মান সূর্যের রঙ অর্থাৎ শুরুর রঙ; সাদা পরিপূর্ণতার রঙ আর কোরকের রং হলদে, যা হল ত্যাগ ও জ্ঞানের নির্দেশক।

হংস ঃ হংস প্রতীক পরমহংস চরিত্র বিশিষ্ট। জনশ্রুতি আছে, রাজহংস জলে মিশ্রিত দুধ জল থেকে পৃথক করে খেতে পারে। তবে সাধারণ পাতিহাঁসও কাদা ও নর্দমা থেকে তার নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুকে খুঁজে নিতে পারে। হংসের এই চরিত্র সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য অনুসরণীয়। জল থেকে দুধ আলাদা করা এবং কর্দম থেকে খাদ্যবস্তুকে আলাদা করা যেমন হংসের চরিত্র, তেমনি মানুষের চরিত্র হওয়া উচিত অজ্ঞানতা, অন্ধকার ও মিথ্যা থেকে সত্যকে স্বতন্ত্র করে তাকে অনুসরণ করা।[৫]

জল, জলঘট ও পূর্ণকুম্ভ ঃ ভারতীয় দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও চিত্রকলায় জল, জলঘট ও পূর্ণকুম্ভের অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ। জলের চরিত্র সকল মানুষের অনুসরণীয়। জল স্বচ্ছ, জীবনদায়ী, সমতারক্ষাকারী, সদা সঞ্চরণশীল ও গতিশীল। জল আপন স্তরে উঁচুনীচু প্রভেদ রাখে না, সে অর্থে জল সমদর্শী। বদ্ধ জল পঙ্কিলগ্রস্ত হতে পারে তাই সে গতিশীল, জল সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রবহমান থাকতে চায়; জল আত্মপরিশ্রুতমান। নোংরা জল স্থির থাকলেই স্বচ্ছ হয়। ধ্যানী মানুষও চিন্তার উঁচু স্তরে গভীর মনোনিবেশের মাধ্যমে বা ধ্যানের মাধ্যমে আত্মপরিশ্রুত হতে পারে। জল জীবনের উৎসরূপ, ছন্দোময় ও প্রাণময়। আপন ঊর্মিমালায় জল আত্মনৃত্যরতা সঞ্চারিনী শক্তিরূপিনী, মুক্তি বা গঙ্গারূপিনী। তাই জল শুধু জীবের জীবন রক্ষাই করে না, মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে তার আপন চরিত্রের মাধ্যমে। জলঘট এবং পূর্ণকুম্ভ জলধারণ করেই জলচরিত্র প্রাপ্ত হয়। জলচরিত্র অনুসরণ ব্যতীত পূর্ণকুম্ভ বা পরিপূর্ণ জ্ঞান কখনওই সম্ভব নয়।[৬]

অস্ত্র ঃ হিন্দু দেবদেবীর হাতে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ধারণরত অবস্থায় দেখা যায়। অস্ত্রগুলি প্রতীকধর্মী। যেমন সুদর্শনের বা সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যতীত বিষ্ণু বা পরম অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বজ্ররূপ জ্ঞান প্রাপ্তির ফলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য – এই ষড়রিপু দূর হতে পারে। বুদ্ধ পেয়েছিলেন বজ্রসত্য।

বাইবেলে আদম ও ইভের কাহিনীতে সর্প কামনার প্রতীক, নিষিদ্ধ বৃক্ষ যৌনতার প্রতীক এবং আপেল যৌনসুখের প্রতীক বা ভোগের প্রতীক তাই ঈশ্বর আদম এবং ইভকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ ও আপেল থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়েছেন।

খ) মনোপ্রতীক ঃ

যে প্রতীক মনের আকাশ বা মানসজগতের সঙ্গে যুক্ত তাদের মনোপ্রতীক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রতীকগুলি বস্তুত প্রকৃতি ও বস্তু জগতেরই অংশ কিন্তু মানব মনে এদের প্রভাব চিন্তার পরিবর্তন আনে। নীল রঙ অসীমত্বের, সবুজ রঙ বর্ধিষ্ণু জীবনের, গৈরিক ত্যাগের, গোলাপি রোমান্স ও প্রেমের এবং শ্বেত শান্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও পরিপূর্ণতার প্রতীক। আকাশের নীল রঙ এবং সমুদ্রের নীল রঙের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন (বাতাস ও সমুদ্রের খেলাই সেই রঙের কারণ), কিন্তু সাধারণভাবে মনুষ্যদৃষ্টিতে এই অসীম অনন্ত আকাশ এবং সমুদ্র নীলরঙেই দৃশ্যমান হয়। এই দৃশ্যমান নীল রং অনন্ত আকাশের সীমাহীন গভীরতার প্রতীক। অন্তহীন নীলিমার দিকে তাকিয়ে আমরা নিজের অস্তিত্বের ঊর্ধ্বলোকে অনন্ত সত্তার অনন্ত মহিমাকে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করে উদাসীন হই, বিস্মিত হই অসীম অস্তিত্বের নিরন্তরতায়। মনকে ঊর্ধ্বলোকে বিন্যস্ত করার জন্য এই নীল আকাশের দৃশ্য সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী। আবার জীবন্ত পৃথিবীর রঙ সবুজ তাই এই ঘন সবুজ আমাদের চোখের জন্য আরামদায়ক, মনের জন্য তৃপ্তিদায়ক; এই সবুজ যেন জীবনের উৎস। আবার সবুজ জীবন যখন পাংশু পতনোন্মুখ তখন তার রঙ হলদে বা গৈরিক; এবং এই হলদে এবং গৈরিক রঙ ত্যাগের প্রতীক। সমস্ত রঙের পরিপূর্ণতা ঘটে সাদায়; তাই সাদা রঙ পূর্ণত্বের প্রতীক।

গ) দেবপ্রতীক ঃ

হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী মাত্রেই প্রতীক। দেবদেবীদের বাহ্যিক কোনও অর্থ নেই। তাঁদের নিহিতার্থের উপলব্ধি এবং অনুসরণ জীবনের মহৎ অভীষ্ট লাভে সাহায্যকারী। এখানেই হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর সঙ্গে গ্রীক ও রোমান দেবদেবীর পার্থক্য। গ্রীক ও রোমান দেবদেবী শক্তি ও রূপের বাহ্যিক প্রতিফলন, তাতে আধ্যাত্মিক কোনও গভীরতা নেই। সেখানে দেবতা ও মানুষের তফাত শুধু ক্ষমতার নিরিখে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর বাহ্যিক রূপ গভীর আধ্যাত্মিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে দেবদেবীদের প্রীত করার কোনও লক্ষণ নেই। তাদের অর্থানুভব এবং অনুসরণই মূল কথা। যেমন দেবী সরস্বতী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায়ের প্রতীকের সমষ্টিমাত্র। সরস্বতীর ব্যাখ্যা দিলেই তা প্রতীয়মান হয়। দেবী সরস্বতীর গায়ের রঙ শ্বেত শুভ্র, বসন, বাহন রাজহংস এবং পদতলে প্রস্ফুটিত পদ্ম সবকিছুই শ্বেতরঙের। এই রঙের দ্বারা জ্ঞানের চরম বিকশিত হবার রূপ বুঝিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত শ্বেত রঙের দ্বারা বিদ্যার্থীর নির্মল চিত্ত এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। রাজহংসের চরিত্র পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। পদ্ম চরিত্র পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সরস্বতীর হাতে বীণা যার বিভিন্ন তার মনের বিভিন্ন গ্রন্থির প্রতিরূপ, তাই যিনি বীণা বাজাতে অক্ষম তিনি বীণা বাজালে বেসুর ও বিশৃঙ্খল শব্দ তৈরি হয় কিন্তু যিনি তারের বিভিন্ন শব্দের সমণ্বয় সাধন করে বাজাতে পারেন তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন ঐক্যতান। এক্ষেত্রে সরস্বতীর পূজা বলতে বোঝায় সরস্বতীর মূল অর্থ অনুধাবন করা।[৭]

বৌদ্ধ দেবী তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, দেবমূর্তি অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতিও প্রতীকরূপ। তারা বুদ্ধের শক্তির প্রতীক, প্রজ্ঞাপারমিতা জ্ঞানের প্রতীক এবং অবলোকিতেশ্বর করুণার প্রতীক।

শিব ও দুর্গা অস্তিত্বশীল জগৎ সত্তার চেতনা ও শক্তি প্রবাহের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে শিব ও দুর্গা চেতনা শক্তির প্রতীক। বিষ্ণু অস্তিত্বের প্রতীক, গঙ্গা মুক্তির প্রতীক, সৃষ্টির লয়কালীন অবস্থার প্রতীক কালী। এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর ধারণকারীর প্রতীক গায়ত্রী। সুর ও ঐকতানের প্রতীক সুর বা দেবগণ। বিশৃঙ্খলা, বেসুর ও অনৈক্যের প্রতীক অসুর বা দৈত্যগণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবদেবীর চরণে নিবেদিত ফুল পূজারীর হৃদয়ের প্রতীক। গভীরার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব যেমন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক; আবার শিব যেমন বিভিন্ন রূপে যথা সদাশিব, ধ্যানী শিব, নটরাজ শিব প্রভৃতি রূপে শান্তি, ধ্যান এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক তেমনি দুর্গা ও কালী পরা ও অপরা প্রকৃতির প্রতীক।

স্বপ্নপ্রতীক ঃ

স্বপ্নপ্রতীক বিষয়ে স্বপ্নাশ্রয়ী চিত্রকলার উপাধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭। স্বপ্নাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

স্বপ্নলোকের স্মৃতি ও চেতনা কিংবা বৃহদর্থে স্বপ্নপ্রতীক শিল্পীর চিত্রবিষয় এবং তার প্রকাশভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। পরাবাস্তব চিত্র, আপাতদৃষ্টিতে অমূর্ত ও অবাস্তব চিত্র কিংবা কিম্ভূতকিমাকার আকৃতিবিশিষ্ট চিত্র প্রকৃত বিচারে শিল্পীর চেতনার বিভিন্ন স্তর বহির্ভূত নয়। নির্জ্ঞান, অবচেতন এবং সুপ্ত চেতনার স্তর প্রতীকাকারে অথবা বাস্তবের বিকৃতাকারে স্বপ্নলোকে ভেসে ওঠে। স্বপ্ন ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং চেতনার স্তরের সঙ্গে যুক্ত। স্বপ্নকে বিচার বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত ধারণাগুলি প্রতীয়মান হয় –[৮]

১) স্বপ্ন অনেক অতৃপ্ত এবং অবদমিত কামনা পূরণ করে। তবে ব্যক্তি যে ভাবে সেগুলিকে পূরণ করতে চায় সেভাবে পূরণ করতে পারে না কারণ স্বপ্নে কাঙ্খিত বস্তু বা ব্যক্তি ভিন্ন প্রতীকে আবির্ভূত হয়।

২) স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম নয়। কারণ স্বপ্নের ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রম স্বপ্নস্তরে ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না।

৩) স্বপ্নে আলো আঁধারি ভাব থাকে বেশি। স্বপ্নে বিভিন্ন রঙের খেলা কম। সাধারণত সাদা ও কালো ছবির প্রাধান্য থাকে।

৪) স্বপ্ন সাধারণত নিকট অতীতকেন্দ্রিক; সুদূর অতীত স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হলেও তার সংখ্যা খুবই কম।

৫) স্বপ্নে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও আতঙ্ক, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, মিলন ও বিরহ সবকিছুই চরমভাবে প্রকাশিত হয়।

৬) স্বপ্নে বিষয়বস্তু ও গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এমনকি এক মুহূর্তে বহু ঘটনার স্তর পরিবর্তন ঘটতে পারে; ফলে একই বিষয়ের ধারাবাহিকতা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই স্বপ্নের পরিবর্তন অতিনাটকীয়।

৭) স্বপ্নে প্রতীকের মাধ্যমে বাস্তব বহু বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। স্বপ্ন সর্বদা অতীত নির্ভর নয়; ভবিষ্যতেরও দিশারী।

৮) স্বপ্ন সৃজনশীলও হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় স্বপ্নে মানুষ যা দেখে তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, দ্রুতগামী, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ছায়া সুনিবিড়, শান্ত, ভয়ংকর, অতি সুন্দর, অতি কুৎসিত, অতি রোমান্টিক এবং অত্যন্ত ঘৃণাজনক। আমাদের চিন্তাভাবনার এবং বাস্তবজ্ঞান নির্ভর সবকিছু স্বাভাবিক থেকে পরস্পর চরম বিরোধী জিনিসগুলোকে এবং অবস্থাকে আমরা স্বপ্নের জগতে পাই। তাই স্বপ্নে অতি আনন্দ, অতি দুঃখ, চরম উন্নতি আবার চরম পতন এই দ্বি-মেরুকরণই সম্ভব। তবে স্বপ্নে আবির্ভূত প্রতীকের অর্থ অনুধাবন করতে না পারলে স্বপ্নের বিষয় অনুধাবন সম্ভব নয়। স্বপ্নে পশু মানুষের ভূমিকায় এবং মানুষ পশুর ভূমিকায়, মিত্র শত্রুর ভূমিকায় আবার শত্রু মিত্র ভূমিকায় থাকতে পারে। ভূত, প্রেত, পরলোক ও দৈব বিশ্বাসী ব্যক্তির স্বপ্ন বেশি প্রতীক নির্ভর হয়। অতি উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি স্বপ্ন বিলাসীও হতে পারে। তবে চিত্রের সঙ্গে স্বপ্নের যোগসূত্র কোথায় তা নির্ণয় করাই এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। এমন ভাবা অমূলক নয় যে চিত্রশিল্পীও সর্বাবস্থায় বাস্তব অভিজ্ঞতা বা দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হন না। স্বপ্ন দিদৃক্ষা অনেকের মনেই প্রবল। এবং তাঁরা বহু সময় স্বপ্নপ্রভ স্মৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিত্রাঙ্কন করেন। স্বপ্নে দেখা রোমান্টিক পরিবেশ, নৈসর্গিক দৃশ্য, কোনও ঘটনার দৃশ্য এমনকি কোনও নারী বা পুরুষের মুখ মনে গভীর ছাপ রেখে যেতে পারে; এবং আপন মনে রঙ তুলি নিয়ে কর্মনিষ্ঠ অবস্থায় চলে যেতে পারেন স্বপ্নলোকের সুন্দর স্মৃতিচারণায় এবং সেই স্মৃতি বিকশিত হতে পারে শিল্পীর সৃজনশীল তুলিতে। শিল্পী তুলির টানে অবলীলাক্রমে স্বপ্নের দৃশ্যকেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন। স্বপ্নলোকের ভাবাবেগ চিত্রে প্রতিফলিত হতে পারে। স্বপ্নে অনেক কিম্ভূতকিমাকার জীবদের দেখতে পাওয়া যায়, এরা আসলে প্রতীকধর্মী কিন্তু শিল্পী সেই আকৃতিবিশিষ্ট জীবকে চিত্রাঙ্কিত করতে পারেন।

৮। নির্জ্ঞান-চেতনাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

স্বপ্নাশ্রয়ী চিত্রকলার সমান্তরালে প্রায় সমধর্মী এবং বহুলাংশে সাদৃশ্যমূলক হল নির্জ্ঞান-চেতনাশ্রয়ী চিত্রকলা। শিল্পীর মনে শিল্পসত্তার অন্তস্থলে অনেক সময় সুপ্ত থাকে তার নির্জ্ঞান ও অবচেতন মনের কামনা, বাসনা ও গোপন আকাঙ্ক্ষা। মানুষ হিসেবে শিল্পীর মনোজগত বহুলাংশে তার নির্জ্ঞান চেতনা এবং অবচেতন স্তরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রভাব অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। শিল্পী তার সৃজনকর্মেও অনেকসময় তার অবচেতন ও নির্জ্ঞান স্তরের মনোবাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিত্রাঙ্কন করতে পারেন।[৯] শিল্পী হয়তো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই এমন নারীর ছবি অঙ্কন করলেন যা বহুলাংশে তাঁর মনের অন্তস্থলে লুকিয়ে রাখা কোনও এক নারীর প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই নারীর ধ্যান হয়তো শিল্পী নির্জ্ঞান স্তরে বৃহৎ স্থান দখল করে নিয়েছে কিন্তু সজ্ঞান স্তরে তার কোনও প্রতিফলন নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবিতে অধিকাংশ নারী মূর্তির নাকের আকৃতি প্রায় একই রকমের। রবীন্দ্রনাথ স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে ওই নাকটি তাঁর বউঠানের নাকের প্রতিবিম্বস্বরূপ। অতীতের কোনও কাহিনী শিল্পীর ছায়াসঙ্গী হতে পারে, স্থান নিতে পারে নির্জ্ঞান স্তরে; বাস্তবে তার প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত না হলেও তা সূক্ষ্মস্থান হতে পারে শিল্পীর তুলিতে।

৯। কল্পনাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

সার্বিক ভাবে বাস্তব, অবাস্তব, আদর্শবাদী– যে কোনও স্তরের চিত্রকলাই কমবেশি কল্পনা আশ্রয়ী। তবে বাস্তবের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যমূলক হলেও প্রকৃতির নির্দিষ্ট কোনও স্থান, বিষয়, ব্যক্তি বা জিনিসের অনুকরণ না হয়ে চিত্র যখন সম্পূর্ণ কল্পনাকে আশ্রয় করে তৈরি হয়, সে ধরনের চিত্রকেই প্রকৃত কল্পনাশ্রয়ী বলা সমীচিন। কোনও কল্পিত পাহাড়, হ্রদ বা বনানীর দৃশ্য দিয়ে অঙ্কিত ছবি নিঃসন্দেহে কল্পনাশ্রয়ী; কারণ অঙ্কিত নৈসর্গিক দৃশ্যটি বাস্তবে কোনও কিছুর অনুকরণ নয়, যদিও বাস্তব জগতের হ্রদ, পাহাড়-পর্বত এবং বন-জঙ্গলের অস্তিত্ব অতি স্বাভাবিক। কল্পনাশ্রয়ী চিত্র কোনও কল্পিত যুদ্ধের ছবি হতে পারে যে যুদ্ধ বাস্তবে কোনওদিনই ঘটেনি। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী দেবদেবীর দৃশ্য তত্ত্বাশ্রয়ী হলেও স্বর্গের দৃশ্য সাধারণত শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে কল্পনাশ্রয়ী চিত্রাবলীর পরিসীমা টানা খুবই কঠিন। চারুকলার জগতে সৃজনক্রিয়া মাত্রেই বহুলাংশে কল্পনাশ্রয়ী। সে দিক বিচারে চিত্রকলায় সৃষ্টি ও বিস্তার এবং যুগ যুগ ধরে তার বিবর্তন কল্পনাকে আশ্রয় করেই সম্ভব হয়েছে।

১০। ভাবাশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

যখন কোনও চিত্রে শিল্পী চিত্রায়িত বিষয়বস্তুর বাস্তবতাকে গৌণ করে সেই বিষয়ের দর্শনে তার সে ভাবের উদয় হয়েছিল সেই ভাবকেই অঙ্কনে মুখ্য করেন তোলেন তখন সেই চিত্রকে ভাবাশ্রয়ী চিত্র বলা হয়। ভাবাশ্রয়ী চিত্রের উপস্থাপনা শিল্পীর মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, আগ্রহ, ধ্যান-ধারণা এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবের ওপর নির্ভর করে। ভারতে রাজপুত চিত্রকলায় যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী চিত্রিত বিষয়ের অঙ্গ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর ভাব নির্ভরশীল। সময়, কাল ও ভাব দৃশ্যপট চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুত রাগিনী চিত্র, ইউরোপের ইমপ্রেশনিস্ট এবং এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা প্রভৃতি ভাবপ্রধান চিত্র। তবে ভাব ব্যতীত কোনও চিত্রই সম্ভব নয়; ভাবের কম-বেশি মাত্রার পার্থক্য থাকতে পারে মাত্র।

১১। স্মৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকলা ঃ

কোনও মৃত ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি, শিল্পীর জীবনে বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিনির্ভর ছবি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনও চিত্র প্রভৃতি নিঃসন্দেহে স্মৃতি-আশ্রয়ী। বস্তুতপক্ষে স্মৃতি-আশ্রয়ী চিত্রের সংখ্যা অন্য যে কোনও ধরনের চিত্রের চেয়েই বেশি। স্মৃতি সতত বিস্মৃতমান, ফলে যত বেশি সময় গড়িয়ে যায় স্মৃতি তত ফিকে হয়। যেমন, ইমপ্রেশনিস্ট চিত্র কোনও দৃশ্যাবলোকনের অব্যবহিত পরেই অঙ্কিত ছবি। কিন্তু তা যদি দৃশ্য দেখার বহু বছর পরে শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত হয় তবে সেই বিস্মৃতপ্রায় দৃশ্য চিত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলিত অবশ্যই হবে না। তবে স্মৃতি যদি গভীর হয়, সে ক্ষেত্রে শিল্পী স্মৃতিকে নির্ভর করে অতীতের দৃশ্য বা ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন তুলিতে। স্মৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকলা বৃহদার্থে ইতিহাস নির্ভর– সেই ইতিহাস আত্মজীবনীমূলক কিংবা সমষ্টিগত বিষয় ও অতীত ঘটনাবলীর বিন্যাস যাই হোক না কেন।

১২। অলীকাশ্রয়ী ঃ

সৃজনশীল মন বাস্তব থেকে কল্পলোকে এবং কল্পলোক থেকে অলীক রূপের জগতেও বিচরণ করে। কল্পরাজ্যের রূপ ও বিষয় বাস্তবসম্মত না হলেও কিয়দংশে বাস্তবের অনুকরণে নন্দিত হয়; বাস্তবকে কল্পনার রূপে রঞ্জিত করে সাজিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু তাতেও চঞ্চল মনের গতি অস্তিমিতই থেকে যায়। মন চলে যায় এমন এক জগতে যে জগতের সীমা কল্পলোকের সীমারও বাইরে। সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে অসম্ভবের সুন্দর

জগতে মন শান্তি পেতে চায় আর সেই অসম্ভবের চিত্রই অলীকাশ্রয়ী চিত্র। তবে সকল অসম্ভব চিত্রই অলীক নয়। লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি যখন এরোপ্লেনের নকশা এঁকেছিলেন তখন তা ছিল অলীকাশ্রয়ী, কিন্তু বিজ্ঞান ও কাল তাকে বাস্তবায়িত করেছে। এই অজ্ঞাত বিশ্বে কি সম্ভব, কি অসম্ভব, কী আছে, কী নেই, কোনটি বাস্তব, কোনটি চির কল্পনা, আবার কোনটি অনন্তের নিরিখে অলীক বলা দুষ্কর। এ যেন সীমার সম্ভাব্যতার গণ্ডি ছাড়িয়ে অসীমের অনন্ত কল্পলোকে পাড়ি জমানো।

সাহিত্যে অলীকত্বের আশ্রয় সর্বজনবিদিত। চিত্রেও সে অলীকত্ব স্থান পেয়েছে সর্বকালে। যিশুর মাতা মেরী এবং খৃস্টান সন্ন্যাসীদের মাথার চতুর্দিকে ও পেছনে যে আলোকপ্রভা বিভিন্ন চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে তা অলীক। স্বর্গ-সুখের ছবি, নরকের কাল্পনিক দৃশ্য এবং মৃত্যুহীন অমৃতলোকের চিত্রাবলী অলীক কল্পনাপ্রসূত। তত্ত্ব নির্ভর চিত্রে দেবদূত, পরী, বনদেবতা ও সমুদ্রদেবতার ধারণাও প্রকৃতপক্ষে অলীক রূপ ও বিষয় বিন্যাসের ফসল।

১। Nelson Goodman : *Languages of Art*, Oxford University Press, London, 1969, page 6-7

২। Ibid, page 6-9

৩। শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৫-৩৫৩

৪। Sailen Debnath, The meanings of Hindu Gods, Goddesses and myths, Ch.- The White Lotus and its meaning, Rupa & Co., Delhi, (In the Press)

৫। Ibid, Ch.- Saraswati.

৬। Ibid, Ch.- Purnakumbha : The Jar full of wisdom.

৭। Ibid, Ch.- Saraswati.

৮। Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, Ed. by James Strachey, Penguin Books Ltd. Middlesex, England, 1982, pp - 133-143, 333-361

৯। Ibid, pp- do

চিত্রকলা ও সমাজ

চিত্রবস্তু ও সমাজ ঃ চিত্রজগৎ, ব্যক্তিমন, সমাজ ও চিত্র-সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজপ্রেক্ষিত চিত্র সম্ভাবনা এবং চিত্রমাধ্যম সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন কিংবা সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার অথবা প্রভাবিত করার সম্ভাবনা অনস্বীকার্য। চিত্রের সামাজিক প্রেক্ষাপট যেমন সত্য, সমাজের ওপর চিত্রের প্রভাবও সমানভাবেই সত্য। এক্ষেত্রে আলোচনার প্রথম ধাপে চিত্র কোন কোন বিশেষ গুণের জন্য জনমানসে আদরণীয় হতে এবং বাড়তি স্থান দখল করতে সমর্থ হয় এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। শিল্পবস্তুর মধ্য সাহিত্য, ভাস্কর্য ও সঙ্গীতের মতোই চিত্র জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিন্তু বিশেষ কয়েকটি কারণে ও গুণাবলীর জন্য চিত্রের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা অন্য সকল শিল্প বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি। চিত্রের সেই সকল বিশেষ গুণাবলী বিশ্লেষণের মধ্যে সেই সমাজের ওপর চিত্রের প্রভাব এবং চিত্রের ওপর সামাজিক প্রভাব নির্ণয় ও বিচার সম্ভব।

চিত্রবস্তুর সুবিধা-অসুবিধা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ঃ শিল্পবস্তুর মধ্যে সাহিত্য এবং বিশেষ করে সঙ্গীত আকর্ষণীয়। সঙ্গীত মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে এবং মনের গতির পরিবর্তনে এর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু প্রভাবের সার্বিকতা ও সার্বজনীনতার নিরিখে ও পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট অনুভব্য যে চিত্রের সর্বজনগ্রাহিকা শক্তি অধিকতর। সাহিত্য ভাষা ব্যতীত বিকাশ লাভ করে না। প্রথমত যে ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে সে ভাষা না জানলে সাহিত্যগুণ ও বিষয়বস্তু উপলব্ধির পর্যায়ে আসে না। দ্বিতীয়ত সাহিত্যরস অনুভব ও উপভোগের জন্য শিক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শুধু ভাষা জানলেই হবে না, সে ভাষার লিপি ও পাঠজ্ঞান ছাড়া সে ভাষায় সাহিত্যপাঠ অসম্ভব। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনুভব ও উপভোগের বিষয়টি একটু ভিন্নতর। সঙ্গীতানুভব ও উপভোগের জন্য শিক্ষিত হওয়া বা লিপিজ্ঞানের আবশ্যিকতা নেই, ভাষা জ্ঞান অপরিহার্য। ভাষা জ্ঞান ব্যতীত সঙ্গীতের মর্মার্থ জানা যায় না। সুর সামঞ্জস্য, তান, লয়, ছন্দ, উত্থান ও পতনের মাধ্যমে শুধু সঙ্গীতের গতিধারা ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় মাত্র। অর্থাৎ সঙ্গীতটি কোনও যুদ্ধে গমনের সঙ্গীত, আনন্দ কিংবা দুঃখের বিষয়কেন্দ্রিক সঙ্গীতটি মনকে উদ্দীপিত করে না বেদনাহত করে তার ইঙ্গিত বোঝা যায়। কিন্তু চিত্রকলা ভাষা ও শিক্ষার প্রাচীরে আবদ্ধ নয়। চিত্রযুক্ত এবং তার বিষয়বস্তু অনুভবের জন্য ভাষার প্রতিবন্ধকতা বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। এই দিক বিবেচনায় জনমনে প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রের কিছু বাড়তি সুবিধা আছে।

চিত্রবস্তু তার নাটকীয় গুণের জন্য, বর্ণ ও ভাবের ব্যঞ্জনাভিত্তিক প্রকাশধর্মিতার জন্য অশিক্ষিত জনমনেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হতে পারে। ভাষা কিংবা শিক্ষা বোধগম্যতায় বাধা সৃষ্টিতে কার্যকরী হয় না।

চিত্রের সাথে ভাস্কর্যের অর্থাৎ চিত্রবস্তুর সঙ্গে তুলনায় মূর্তির বিষয়কেন্দ্রিক বার্তাবাহী ক্ষমতা কম। ভাস্কর মূর্তিবস্তুকে যতই উৎকর্ষের চরম শিখরে নিয়ে যান না কেন চিত্রকলার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতাকে কোনও অবস্থাতেই অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি চিত্রের কয়েকটি বিশেষ বাড়তি গুণ ভাস্কর্যে বিকশিত হয় না। ভাস্কর্য ত্রি-মাত্রা বিশিষ্ট হলেও নিকট ও দূর জ্ঞান অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত বস্তু বিষয়ের পারস্পরিক দূরত্বে সংস্থাপন এবং পারস্পরিক দূরত্বকে প্রতীয়মান করে তোলা যায় না। এক কথায় পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কোনও দৃশ্যপটকে অনুধাবনযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। বস্তুর দূরত্ব, আকাশ ও বহমান বাতাসের চিহ্ন ছাড়া নৈসর্গিক দৃশ্যকে দেখানো ও বোঝানো যায় না। একমাত্র চিত্রমাধ্যম পরিপ্রেক্ষিতের সুন্দর ব্যবহার ও প্রয়োগ চিত্রের উপযোগিতাকে ভাস্কর্যের চেয়ে অনেকগুণ বেশি বাড়িয়ে তুলেছে; কারণ ভাস্কর্যে পরিপ্রেক্ষিতের অবকাশ নেই।

চিত্রমাধ্যমে সাধারণত যে কোনও বিষয়কেই তুলে ধরা যায়। যে কোনও মানুষের প্রতিচ্ছবি থেকে শুরু করে দীর্ঘ ঘটনা, ধারাবাহিক বর্ণনা চিত্রে সম্ভব। দেওয়ালচিত্র, যেমন অজন্তার চিত্র ও তিব্বতের স্ক্রোল চিত্র তার সাক্ষ্য বহন করে। চিত্রের বিকাশধর্মীতার সঙ্গে বর্ণালীর বিভিন্নতা সাযুজ্যপূর্ণ। সাধারণ অশিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ চিত্রমাধ্যমে চিত্রিত ঘটনার বিষয় জানতে পারে।

চিত্রবস্তুর অনেকসময় দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ না করলেও চিত্র এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজ বহনযোগ্য, এবং তা সহজেই প্রদর্শনযোগ্য। এই কারণেই চিত্রাদর্শ ও চিত্রপ্রভাব দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন যুগে ইতিহাসের গতিপথে চিত্রের আন্তর্দেশীয়, আন্তর্মহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতায় চিত্রবিষয়, চিত্ররূপ ও আদর্শের প্রভাব লক্ষ্যণীয়ভাবে সর্বজনস্বীকৃত। ভারতীয় বৌদ্ধচিত্রধারা সুদূর চীন, তিব্বত ও জাপানের সহস্র বছরের চিত্রের ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছে। আবার সুদূর প্রাচ্যের চিত্র আধুনিক ভারতীয় চিত্র-আন্দোলনকে নাড়া দিয়েছে। অপরদিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে ইউরোপীয় চিত্রাদর্শ মোগল-চিত্রধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আনয়নেও ভূমিকা নিয়েছিল। বর্তমানে ভারতের আধুনিক চিত্রে ইউরোপীয় প্রভাব বলাই বাহুল্য।

চিত্রের প্রভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সাহিত্যের বিবর্তন ত্বরান্বিত করেছে তা এই পরিচ্ছদের আলোচ্য বিষয় নয়, শুধু এইটুকুই এখানে বলা অযৌক্তিক নয় যে ইউরোপীয় চিত্রান্দোলনগুলির মধ্যে সুররিয়ালিজম, কিউবিজম, ইমপ্রেশনিজম ও এক্সপ্রেশনিজম বিশ শতকের সাহিত্য আন্দোলগুলির পূর্বসুরী রূপে কাজ করেছে। এই আন্দোলনগুলির প্রভাব যে আন্তমহাদেশীয় ঢেউ তৈরি করেছিল বাংলার কবি সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকদের লেখনীতেও তা আছড়ে পড়েছে। চিত্র ও সাহিত্যের এই পারস্পরিক প্রভাব দর্শনে একটি প্রশ্ন উঁকি দেয় তা

হল এই দুই ধারার মেলবন্ধনের কারণ কি? এই কারণের গোড়া হচ্ছে মানব মন ও সমাজ – মানুষের আশা-নিরাশা এবং কালের গতিপথে জীবন ও সমাজের সমস্যার অভিন্নতা। এই প্রসঙ্গেই মানব মন ও সমাজ নিয়ে একটু ভাবা উচিত। আমাদের দেখতে হবে আদিম ও আধুনিক মানুষের মনের বনিয়াদ আশা এবং সমস্যাভিত্তিক সমাজের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ও লক্ষ্যের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা। জ্ঞানের জগৎ পরিধি উচ্চতায় ও গভীরতায় প্রসারিত হয়েছে সত্যই, কিন্তু সমস্যা প্রাচীনের মতোই রয়েছে অপ্রতিরোধ্য। কয়েক হাজার বছর আগেও মানুষের দেহগত ও মনোগত যে সকল সমস্যা ও লক্ষ্য কর্মের উদ্দেশ্য ছিল, যে আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তখনও পরিচালিত করেছিল, যে জিজ্ঞাসা তাকে তাড়িত করেছিল, যে কর্মপন্থা তাকে উদ্দীপিত করেছিল, যে পাওয়া না-পাওয়ার যুদ্ধে সে ছিল লিপ্ত – তা এখনও পূর্ববৎ আছে। মাত্রার তফাৎ হয়েছে মাত্র। তার চাহিদাস্বরূপ সুখ ও দুঃখের কারণ, তার আকাঙ্ক্ষার ফল্গু নদী তার প্রাপ্তির আশা নিরাশা উদ্যম ও হতাশার পরিবর্তন কিছুই হয়নি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু, তা আরও জটিলতর হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি। লোভ, লালসা, ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মান অভিমান, ক্ষমতার লিপ্সা সম্পদের লালসা, যৌনোন্মাদনা, চিত্তবিক্ষেপ, অবদমন ও স্বপ্নচারিতা – আদিম জগতের মতোই প্রতি যুগের মানুষকে যেমন অনন্ত জিজ্ঞাসা, দ্বন্দ্ব ও প্রাপ্তির সংগ্রামে উজ্জীবিত ও ক্লান্ত করেছে তা আজও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আধুনিক সভ্য জগতের সমস্যারূপে বিদ্যমান।

মানব অস্তিত্বের রহস্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সভ্য মানুষ এখনো অজ্ঞ। জানা হয়নি তার মানস জগৎ এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু। তার চাহিদা সভ্যতার ঊষালগ্নে সমাজবন্ধনের পথে যা ছিল তাই আছে। তাই আজও চাহিদার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তার অনন্ত সুখ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তির স্বপ্ন এখনও স্বপ্নই রয়ে গেছে। আবদ্ধ সমাজও কিন্তু বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই সুখ ও শান্তির উৎস সন্ধানের পথক্লান্তি তাকে শান্ত করতে পারেনি, আর এই নিরন্তর যাত্রা রূপ পেয়েছে মানুষের শিল্প সাধনায়। সুখ হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়গত আরাম ও উপভোগ। সেই চাহিদা যা মানব ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সমাজবন্ধনে এখনও তা বিদ্যমান। ভোগলিপ্সার স্বরূপেরও কোনও পরিবর্তন হয়নি। যিনি মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন তারও লক্ষ্য পৃথিবীতে গৌরব অর্জন, আর সে গৌরবেরও প্রাপ্তির শেষে সুখ। আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের ভোগলিপ্সা শাণিত হয়েছে এবং অভিনব কোনও সুখের উৎসও আবিষ্কৃত হয়নি, কারণ মানুষের দেহকাঠামো, ইন্দ্রিয়ের খেলা, হরমোনের জাদু নিরন্তর পূর্ববৎ অব্যাহত।

অনেক মানুষ সুখ ভোগের শেষ তৃপ্তি যখন পায় না, হয় ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত। তখন তার অবসাদ তাকে ঠেলে দেয় শান্তির খোঁজে। সুখের প্রাপ্তিতে বাঁধা এবং শান্তির নিরুদ্দেশ যাত্রা অনেক সময় তাকে তাড়িত করে আত্মহননে কিংবা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পথ বেছে নিতে। তবে মানুষ সুখ ও শান্তির সুখের উপায় আবিষ্কারে

বিজ্ঞানের সহায়তায় বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলেও সুখের স্বরূপগত বা মৌলিক পরিবর্তনে সাফল্যের দ্বার উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে।

দুঃখ ও রোগ নিরাময়ে, বার্ধক্যের গতিরোধে এবং মৃত্যুর রহস্যে পাড়ি দিতে পারেনি মানুষ। ব্যর্থতার বেদনা তার আদিম যুগের মতোই গভীর। বিজ্ঞানের দৌলতেও অসহায়তার ছায়া পূর্ববৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমাজভিত্তিক মানুষের চিন্তা-চেতনার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন কিছু হয়েছে বৈকি, কিন্তু বুনিয়াদী কোনও রূপান্তর হয়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন হল, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও পরিবর্তন সম্ভব হয়নি কেন? এর উত্তর রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক সত্তায় – যে আলো ও আঁধার, সত্যাসত্য, উপর-নীচ, জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলবে নিরন্তর ধারায়। বিবর্তনের গতিশীল পথেও এই দুই মেরুর দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবেই। মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা সব কিছুই এই দ্বি-মুখী লড়াইকে কেন্দ্র করেই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে মানবমন দ্বিধাবিভক্ত। এই দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায় স্থান পায় মানুষের সাংস্কৃতিক নির্মাণকার্যে ও সৃজনশীলতায়। যা সে পেয়েছে তার প্রকৃতি, রূপ – তার উদ্দেশ্যে সে ব্যাখ্যা দেয় সৃজনশীল ভঙ্গিতে। তদ্‌স্থানেই গড়ে ওঠে সৃজনশীল কর্মের মহিমান্বিত পুষ্পিত বন। আবার যা সে পায় না – তার উদ্দেশ্যেও গড়ে তোলে কল্পলোকের নাট্যমঞ্চ ও স্বপ্নের আসর। আর এ সকলের ভিত্তিতেও তৈরি হয় একস্তরের সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলা।

ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন, স্মৃতি, স্বপ্ন ও চারুকলা ঃ এই জীবন এক চিরপরিবর্তনশীল বাস্তবতা – স্মৃতি ও স্বপ্ন কুহেলিকা। পেছনে ফেলে আসা অতীত জীবন, অভিজ্ঞতা ও কর্মকে আমরা আর কখনওই পুনরাবৃত্ত করতে পারি না। পরিণত বয়সে ব্যক্তি ফিরে তাকায় অতীতের সুখ দুঃখের দিনগুলির দিকে, শৈশবের দিকে, মত্ত হয় খ্যাতি ও যশের স্মৃতিময়তায় – কিন্তু সে দিন আর ফিরে আসে না। অতীতের হারানো জীবনপর্ব স্মৃতির স্তরে স্তরে জেগে ওঠে, দেয় এক স্বপ্নবৎ পরিবেশ এনে। অতীতই সুন্দর ছিল – এই ভাবাবেশ সৃষ্টি করে বেদনার পরিবেশের। কিন্তু সে সবুজের স্বপ্নের দিন, সে কৈশোর ও যৌবনের উন্মাদনা, গজিয়ে ওঠা কচি পাতার মতো শিহরিত নবীন পল্লবের মতো দিনগুলি কভু ফিরে আসে না। যা ঘটে যায় তার পুনরাবৃত্তি সেই পরিবেশে সেই কালে কখনও ঘটে না। কারণ দেশ কাল পরিবর্তনশীল। অতীত শুধু স্মৃতির বিষয় হয়েই জেগে থাকে ব্যক্তিমনে, সুপ্ত থাকে মগ্নচৈতন্যে, ভেসে ওঠে স্বপ্নলোকের তন্ময়তায়। অতীতকে ফিরে পাওয়া যাবে না শুধু এই কারণেই অতীত স্মৃতি বেদনাময় হয়, জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে তাই অতীত বেদনার সৃষ্টি করে শুধু তাও নয়, অতীতকে পুনরাবৃত্ত করা যাবে না, এই অতীতের কোনও ভুল পদক্ষেপ সংশোধন করা যায় না, যায় শুধু সেই ভুলের প্রাসঙ্গিক বর্তমানকে পরিবর্তন করা, সে কারণেও অতীত স্মৃতি বেদনাময়। স্মৃতি গৌরবের হলেও তা বেদনাময় কারণ সে গৌরবান্বিত মুহূর্তটি আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

যে ঘটনা ঘটে যায় তার উপর আর ব্যক্তির কোনও হাত থাকে না, আর কৃতকর্মের স্মৃতিকেও মুছে ফেলা যায় না, স্মৃতিকে সংশোধন করা যায় না, এই মৌলিক বিচারে ব্যক্তজীবন দেশ-কাল ও সমাজনির্ভর হলেও ব্যক্তির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তার নিজ সত্তা নির্ভর। সে কারণেই একই কাল ও সমাজের অধীন হলেও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনধারা, তার চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ও আলাদা। তাই শিল্পী ও শিল্পরসিক সমাজ এবং কাল নির্ভর হয়েও দৃষ্টিভঙ্গিতে আপন সত্তা নির্ভর। তার চেতনা ও মগ্নচৈতন্য একান্ত নিজস্ব। প্রতিটি ব্যক্তির মনের আকাশ বা মানসজগৎ অন্যের মানসজগৎ থেকে আলাদা। যেহেতু অতীতকে পরিবর্তন করা যায় না, স্মৃতির পরিবর্তন সম্ভব নয়, এবং অতীত কখনও পুনরাবৃত্ত হয় না, সে কারণে সমাজ ও দেশকালের গতিপথে ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি অভিজ্ঞতা নতুন, এবং প্রতিটি পদক্ষেপ অভিনব। তাই বাস্তব চিরপরিবর্তনশীল। যে রাস্তা দিয়ে ব্যক্তি বারবার চলাফেরা করেছে সে রাস্তা তার কাছে সম্পূর্ণ জানা, সে দাবি সে করতে পারে না। জানার জগৎও আপেক্ষিক। তাই প্রতিটি শিল্পকর্ম ও চারুকলার কাজ অভিনব, নকল হলেও আপেক্ষিকতার দৃষ্টিতে ভিন্নতর। কোনও মানুষ সম্পর্কেও আমাদের কোনও স্থায়ী ধারণা তৈরি করা সমীচীন নয়। প্রতিটি মানুষের অন্তর্জগত ও তার পরিবেশ বদলাচ্ছে। কাউকে চির-শয়তান বা সাধক বলে চিহ্নিত করা ভ্রমাত্মক হতে পারে। তাই কোনও শিল্পীকে কোনও শিল্পাদর্শের গোষ্ঠীভুক্ত করলেও তার মধ্যে ভিন্ন ধাঁচের স্বতন্ত্র ধারাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। যেভাবে পিকাসোর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছিল।

জগৎ ও জীবন পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল ও পুনরাবৃত্তিহীন। এ জীবন আকাশের মেঘের মতোই রূপান্তরশীল। তার বিকাশের প্রতিটি স্তরই শিশির বিন্দুর মতো স্বপ্নবৎ। যে অতীত হারিয়ে গেছে সে শুধু স্মৃতির জগতেই বেঁচে থাকে। কিংবা অতীত বর্তমানে নিমজ্জিত অভিজ্ঞতারূপে, আবার অতীত স্মৃতি ডুবে থাকে মগ্নচৈতন্যে। তবে সে মগ্নচৈতন্য স্বপ্নে বিকশিত হয়। কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে, অথবা কখনও বিকৃতভাবে। তাই নিশীথের স্বপ্নও সুখ, দুঃখ ও রোমান্সের স্মৃতি ও মধুরিমা রেখে যায়, আবার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাও স্মৃতিই রেখে যায়। এই দুই স্মৃতির জগৎ বাস্তবের সঙ্গে তুলনায় আলাদা করা যায়। কিন্তু কখনও স্বপ্ন বাস্তব এবং বাস্তব স্বপ্নবৎ মনে হয়। তাই শিল্প সাহিত্য ও চিত্রকলার জগতে স্বপ্ন ও বাস্তবতা, চেতনা ও মগ্নচৈতন্য সমানভাবেই অভিজ্ঞতা। বাস্তবভিত্তিক চিত্র, স্মৃতিকেন্দ্রিক চিত্র কিংবা কল্পচিত্রের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের আলাদা করেন শুধু শিল্পসমালোচকগণ।

মানুষ যা তৈরি করে, তাকে সে পুনর্নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু জীবন ও জগৎ মানুষের সৃষ্ট নয়। আর প্রকৃতির বুকে অভিজ্ঞতাও মানুষের কর্তৃত্বাধীন নয়। তা নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের উপলব্ধিমাত্র। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার ও জানার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির বিরোধিতায় কোনও সৃষ্টি বা নির্মাণ অকল্পনীয়। মানুষের সমস্ত রকমের নির্মাণকার্য প্রকৃতির নিয়মসাপেক্ষ। নিয়মবিরুদ্ধ কোনও কিছুকে

প্রকৃতি দীর্ঘদিনের জন্য মেনে নেয় না। কিন্তু মানুষের কল্পনাশক্তি প্রকৃতিরই দান। বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই তেমন জিনিসের কল্পনা মানুষ করতে পারে, ভাবতে পারে, তেমন বিষয়ে লিখতে এবং সেরকম জিনিস সে ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় তুলে ধরতে পারে। এভাবেই মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবাতিরিক্ত এবং এমনকি বাস্তবে নেই এমন বিষয়কে শিল্পবস্তুরূপে তুলে ধরতে পারে। এক্ষেত্রে শিল্পের জগৎ বেশি করেই কল্পনাকেন্দ্রিক এবং কল্পলোকেই শিল্পের আশ্রয়। বাস্তবের সীমা শিল্পীর সৃজনশীলতার পরিধি অঙ্কন করতে পারে। অবশ্য শিল্পী তার কল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতিকেই আরও সুন্দর রূপে দেখতে চায়; আপন মনের কল্পনামিশ্রিত ছবির মতো সে প্রকৃতিকে সাজিয়ে নিতে চায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা শুধু বাস্তবের অতিরঞ্জন বা বিকৃতি বা বাস্তবকে আরও সুন্দর ও মহিমান্বিত করার প্রয়াস মাত্র। কখনও তা বাস্তবে বিভিন্নগামী অভিজ্ঞতার কল্পনামিশ্রিত সমণ্বয়। মুখচন্দ্র, রৌদ্ররাগ, পদ্মলোচন, পরমহংস, স্বর্ণমৃগ, গজমুণ্ড-বিশিষ্ট দেবতা (গণেশ), বানরমুখী বীর (হনুমান), অর্ধনারীশ্বর – এ সবই শিল্পী মনের কল্পলোকের ফসল।

শিল্প-সাহিত্য ও চিত্রকলা এবং শিল্পী ও শিল্পরসিকের ধ্যান-ধারণার বিবর্তন পারস্পরিক দুই ধারার বিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল – এর একটি হল ব্যক্তিগত বিবর্তন এবং অন্যটি সামাজিক বিবর্তন। ব্যক্তিগত চিন্তার বিবর্তন ও কর্মপন্থার পরিবর্তন সমাজের বিবর্তনের সহায়ক কারণ সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টি নয়, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তবিশেষের চিন্তার ও কর্মের প্রভাব সমাজকে প্রভাবিত করে। আবার সমাজ সার্বিকভাবে ব্যক্তিকে চালিত করে। তবে একটি ঘটনা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না – তা হল, চিন্তাচেতনার বিকাশ ও বিবর্তন সকল মানুষের মনে সমানভাবে হয় না।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে সমাজের যে পরিবর্তন হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলায়, এমনকি মানুষের মূল্যবোধের ধ্যানধারণায় যে বিবর্তন ও পরিবর্তন এসেছে তার অধিকাংশ সারা বিশ্বে অসাধারণ কিছু ব্যক্তির অবদানের ফসল। আবার সেই সকল বিশিষ্ট প্রতিভাধর মানুষ যারা দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, সমাজসংস্কারক বা ধর্ম প্রবক্তা নামে খ্যাত, তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের যুগের সমাজব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজেরা চিন্তার জগতে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা বিভিন্ন যুগের সমাজকে পরিবর্তিত করেছে সংস্কার ও বিপ্লবের মাধ্যমে। তাঁদের অবদানের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজের ধ্যানধারণার বিরুদ্ধেই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। সক্রেটিস, প্ল্যাটো, এরিস্টটল, বুদ্ধ, লাও-জু, কনফুসিয়াস, পতঞ্জলি, যিশু এমনই অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন যাঁরা সমাজকে মৌলিক পরিবর্তনের দিকে সঞ্চালিত করেছেন। সমাজের পরিবেশ কোনও আর্কিমিডিস, কোপারনিকাস, গ্যালিলেও বা নিউটন কিংবা আইনস্টাইন তৈরি করেনি বা তাদের প্রতিভার সীমারেখা আরোপ করেনি; বরং তাঁদের চিন্তা সমাজের দৃষ্টভঙ্গিতে যুগান্তর এনেছে। সমাজ ডারউইনকে যতটুকু প্রভাবিত করেছে তার বিপরীতটাই হয়েছে অনেক বেশি। ডারউইন সারা

বিশ্বে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। টমাস পেইন ছাড়া আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শগত পরিকাঠামো কিংবা মন্তেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশো ছাড়া ফরাসি বিপ্লবের প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে ভাবা যায় না। আবার মার্কস ব্যতীত বিশ শতকের বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাস অসমাপ্ত। এই সকল দিকবিচারে দেখা যায় সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ও পরিবর্তন সর্বস্তরের মানুষের চিন্তার বিবর্তনের ফসল নয়, তা অনেকাংশেই প্রতিভাধরদের অবদানের সামাজীকরণ।

দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা সত্য তা অনেকাংশেই অনস্বীকার্য সাহিত্য ও চারুকলায়। চিত্রকলার জগতে যে যুগান্তকারী আন্দোলনগুলি হয়েছে তা প্রায়শই প্রচলিত সমাজের রুচি ও ধ্যানধারণার আড়ষ্টতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেই হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ চারুকলা অনেকটা সমাজমুখী ও বাস্তবানুগ হবার ফলে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচিত করেছিল। পরবর্তীকালে ইমপ্রেশনিজম, পোস্ট-ইমপ্রেশনিজম, কিউবিজম, দাদাইজম প্রভৃতি চিত্রান্দোলনগুলি প্রচলিত চারুকলার আদর্শের শুধু বিবর্তন ছিল না, ছিল কখনও প্রতিবাদী এবং কখনও অভিনব পরিবর্তনের সূচনাকারী। এই পরিবর্তনগুলির কোনওটিই জনগণ কিংবা সমাজের চাহিদা ভিত্তিক ছিল না। পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল চিত্রকরদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং তাদের নতুনত্বের সন্ধানে সৃজনশীল হওয়াতে। এক্ষেত্রে এই যুক্তিকেই তুলে ধরা হয়েছে যে ব্যক্তিগত বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন পাশাপাশি চললেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের আবিষ্কার ও সৃজনশীলতা সমাজের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অসম্ভাবী ভূমিকা পালন করেছে। উপরোক্ত পরিবর্তনের ধাপগুলি এবং চিত্রান্দোলনগুলি লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি, মনে, মানে, ভ্যান গগ, পল গগ্যা, সেজান ও পিকাসো ব্যতীত ভাবা যায় না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিধারাই সমাজে নতুন মনোভাবের জন্ম দিয়েছে; এবং সেই মনোভাবও একদিনে তৈরি হয়নি। লিওনার্দো উঁচু মাপের শিল্পী হলেও তাঁর যুগের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে সহসা বিপ্লব তিনি করেননি। চারুকলায় তাঁর সংযোজিত অভিনবত্বে যুগ পরিপন্থী কলাদর্শ শুরুতে স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল না। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে অভিনবত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। আর পিকাসো একাধিক অভিনব পন্থার উদ্ভাবক হলেও জীবনের শুরুতে ঐতিহ্য বিরোধী ছিলেন না। ঐতিহ্যপন্থী প্রতিভার এক উঁচু স্তরে উত্থানোত্তরকালেই তাঁর অভিনব সংযোজনগুলিতে সমাজের কলারসিকরা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং প্রশংসামূলক মূল্যায়ন করেছেন। অন্য যাঁরা নতুন পথের দিশারী হয়েছিলেন মৃত্যুর পরে যাঁদের অবদানকে কলাজগতের রসিক ও সাধারণ মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের জীবদ্দশায় সে স্বীকৃতি মেলেনি এবং অনেকেই অর্থের অভাবে দারিদ্র্যের কশাঘাতে পীড়িত হয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন। তদানীন্তন সমাজের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে এই সকল শিল্পীর অর্থাভাবে দিন কাটাতে হত না। সেজান, পল গগ্যা, ভ্যান গগ তাঁদের কৃতিত্বের মূল্য জীবদ্দশায় পাননি। অবহেলিত হয়ে অতিকষ্টে এঁদের জীবন কেটেছে। এসব কথা অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে সমাজের রুচি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিভাবান শিল্পীর দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই নতুন রুচির আস্বাদ ও মনোভাব বা মূল্যায়ন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ শুধু অনুসরণকারী মাত্র। কথাটি শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও যাকে যুগপ্রভাব (Climate of Opinion) বলে তা কার্যত শিল্পীদের উৎকৃষ্ট অভিনব অবদানের ফসল। পুরাতন ধারণার ও কলাদর্শের বুক চিরে বেরিয়ে এসে কোনও নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা পেলে তাই নতুন যুগাদর্শের সূচনা করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া গণ-মনোভাব (Mass Opinion) এবং সমাজের পছন্দ (Social Choice) বলে কোনও জিনিস অবলীলাক্রমে শিল্পরসের জগতে তৈরি হয় না। শিল্পের ধারণাতেও মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। আর একটি যুক্তি অস্বীকার করার মতো নয়, তাহল সমাজের কোনও নির্দিষ্ট পরিধিকে সকলের জন্য সমানভাবে ভেবে নেওয়া কঠিন। সমাজে সকল মানুষের মানসিক স্তর, যোগাযোগ ও শিক্ষাভিত্তিক পরিগণ্ডী এক নয়। সে যত বেশি উঁচুমাপের মানুষ তার যোগাযোগ তত বেশি এবং সে ততবেশি গণ্ডিকেন্দ্রিক বিভেদের বাইরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। যে শিল্পী বা শিল্পরসিক চিন্তায় রুচিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন তাঁর সমাজও বিশ্বজনীন। যাঁর মনের বিস্তৃতি ঘটেনি – তার সমাজও ক্ষুদ্র এবং তার মানসিকতাও স্থানিক ঐতিহ্যের পরিপোষক হতেই আগ্রহান্বিত থাকে। তবে শিক্ষার মাধ্যমে সে ব্যক্তিত্ব উদার মনের পরিচয় দিতে পারে কোনওদিন। এককথায় সমাজের রুচি ও চাহিদাকে অস্বীকার না করেও বলা সমীচীন হবে যে সমাজের কোনও অপরিবর্তনীয় ঐতিহ্য চিরকাল বহমান থাকে না। এবং সেই ঐতিহ্যও প্রতিভাবান শিল্পীর সৃজনশীল ও অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবাধীন। অনেক সময় শিল্পী আপন মনে সকলের অন্তরালে নিজের শিল্পী সত্তাকে প্রকৃতির সহযোগে পরিপোষণ ও পরিবর্ধন করেন। তার সৃজনশীলতা দেশ-কালের মধ্যে হলেও সমাজের কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ধ্যানধারণার বাহক হয়ে ওঠে না। সে শিল্পী নিজের সৃষ্টির দ্বারা ভাবীকালের পথপরিদর্শক হয়ে উঠলেও সমকালীন যুগে তার সৃষ্ট বস্তুর হয়তো মূল্যায়ন ও অনুধাবন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শিল্পী মনের বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন ঃ শিল্পী সমাজের অংশ হলেও শিল্পীর মানসিক বিবর্তন ও সমাজের বিবর্তন একসঙ্গে বা পারস্পরিক তাল মিলিয়ে সমান্তরাল চলে না। আমরা অনেক সময় ধরে নিই যে কালের গতিপথে সবকিছুই সমানভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। বিবর্তনের ধারা সর্বত্র অব্যাহত থাকলেও তার গুণগত মান সার্বিক বা বিশ্বজনীন নয়। প্রকৃতির নির্বাচন যোগ্যতমের উদ্বর্তন জগৎ বিবর্তনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক সত্য হলেও মানব মনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার সৃজনশীল আকুতি, জ্ঞানদৃষ্টি ও প্রগতিবাদী কর্মপ্রবণতা ব্যক্তিমনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। এক কথায় মানবের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে, তৈরি করে এবং বিবর্তিত করে। সমাজ যেখানেই দাঁড়িয়ে থাক না কেন বিবর্তিত শিল্পী তার ভবিষ্যত যুগের পূর্বসূরী হতে পারেন নতুন কলাদর্শ স্থাপন করে, যা হয়তো তার সমকালীন যুগে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

কালের নিরিখে বিবর্তন যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিমনের বৈপ্লবিক সৃষ্টির ক্ষমতা। এই বিচারে আজ থেকে হাজার বছর আগের কোনও শিল্পকর্ম ও শিল্পবস্তু এমন উৎকৃষ্টমানের হয়ে থাকতে পারে যে, তার উৎকর্ষতা সহস্র বছরেও অমলিন থেকে গেছে। কখনও কোনও শিল্পী তাঁর যুগোত্তীর্ণ হয়ে অনাগত কালের জন্য সৃষ্টি করেন, যা তার যুগের মানুষের কাছে আদৃত হয় না কিন্তু সাদরে গৃহীত হয় পরবর্তী যুগে। সে শিল্পীর সৃজনী প্রতিভা কালে স্বীকৃতি পায় আর অক্ষয় মর্যাদা প্রাপ্তি ঘটে তার শিল্পবস্তুর। বস্তুত শিল্পীমন বা নির্দিষ্ট কোনও সৃজনশীল ব্যক্তিমনের অভিব্যক্তি সমাজের সার্বিক অভিব্যক্তির অনেক আগেই ঘটতে পারে। কারণ ব্যক্তিমনের বিকাশ ও সমাজের বিকাশের ধারা সমান্তরাল নয়। তাছাড়া ব্যক্তির বা শিল্পীর মানসজগত সমাজে অন্য কোনও ব্যক্তির মানস জগতের প্রতিরূপ একেবারেই নয়। সে কারণেই সমাজ, দেশ ও কালের প্রভাব সত্ত্বেও শিল্পীর সৃজনশীলতার স্বাতন্ত্র অস্বীকারের উপায় নেই। এই প্রেক্ষিতে শিল্পীর সৃজনশীল সত্তা স্বাধীন।

প্রশ্ন হল বিবর্তন কথাটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি? শিল্পী মনের বিবর্তন বা সমাজ বিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ইংরেজি evolution শব্দটিকেই বিবর্তন অর্থে আমরা বাংলায় বহুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। evolution মানে কি evolve করছে বা উদ্ভাবিত হচ্ছে? এবং যে বস্তু উদ্ভাবিত হচ্ছে তা বিবর্তিত বা পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে evolve শূন্য থেকে হতে পারে না। যে জিনিসটি evolve করছে তার মধ্যেই সেই evolution বা বিবর্তনের সম্ভাবনা নিহিত আছে। তাই evolution মানে নিহিত সম্ভাবনা বা সুপ্ত আকৃতি, প্রকৃতি, গুণ ও রূপের বিকাশ। অর্থাৎ বিগত লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনে বিশ্বজগত ও প্রকৃতির যা পরিবর্তন হয়েছে তার সমস্ত সম্ভাবনা শুরুতেই নিহিত ছিল। মানুষ যে বিবর্তিত হচ্ছে, সভ্যতা এগিয়ে চলছে তারও কারণ সেই নিহিত শক্তির বিকাশ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষের জিন অপরিবর্তিত আছে। আর এই জিনের মধ্যেই নিহিত ছিল মানবের বিবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনা। আর সেই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটেছে প্রকৃতির বিবর্তনে। এক কথায় এই বিবর্তন হল সম্ভাবনার বাস্তবায়ন। প্রতিটি মানুষের মগ্ন চৈতন্যের যে স্তর তাতে শুধু অবদমিত বিষয়ই লুক্কায়িত থাকে না, চেতনা ও কল্পনার অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনারও মহাসমুদ্র হল মগ্নচৈতন্য স্তর। যে ব্যক্তি যত বেশি বিবর্তিত, তার চেতন স্তর তত বেশি বিকশিত এবং সৃজনশীল কর্মে ও চেতনায় তত বেশি উন্মোচিত তার মগ্নচৈতন্য স্তর। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রতিটি মানুষ অনন্ত জগতের আভাস তার মধ্যে বহন করে। মানবের চেতনার জগত অনন্তের ছায়া। তাই অনন্ত তৃষ্ণায়, অনন্ত চাহিদায় তার যাত্রা অসীমের পথে। কোনও কিছুতেই সে তৃপ্ত হয় না, ক্ষান্ত হয় না, কারণ অসীমের আভাস পায় সে নিজের অন্তর্জগতে আবার বহির্জগতে – দৃশ্যে, সুরে, গানে, গন্ধে। সুন্দরের চেতনা মানুষের দেহ-মনে অন্তঃস্থিত ঘুমপাড়ানি গান ঘুম পাড়ায়, কোনও সঙ্গীত মনকে উদাস করে, কোনও দৃশ্য মনকে নিয়ে যায় এক অজানা লোকের নিমগ্নতায়, মন যায় দূর-দূরান্তর-কোথায়-কেউ জানে না। অজানা কোন সুরের সন্ধানে, কোন রূপের দুর্নিবার আকর্ষণে, কোন শান্তির সুশীতল

দোলায় আন্দোলিত হয় মন – তা কেউ জানে না। মানবের অন্তরাত্মা অসীমের স্ফুলিঙ্গ বলেই আত্মবিকাশের পথে সদা ঘটমান নিরন্তর অভিনব জাগরণ ও ক্রমবিবর্তন বিরামহীন ভাবে হয়েই চলেছে। এভাবেই ঘটে অন্তঃস্থিত শিবময় সত্তার সুন্দরময় মঙ্গলময় ও আনন্দময় বিকাশ। তাই ব্যক্তি মনের বিকাশ ও সামাজিক বিকাশ একই পথে আবর্তিত হয় না। শিল্পীও ব্যক্তিবিশেষ, তাই শিল্পী মনের বিকাশ সবসময় সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না তাই শিল্পী ও বিজ্ঞানী এমন সকল বিষয় ও জিনিসের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেন যা সমাজের অন্যসকলের কাছে সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়। সাধারণ মানুষকে তারা অজানিত দেশের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে হাজির করেন। বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এর সত্যতা প্রমাণিত সাহিত্যিক, সুরকার, ভাস্কর ও চিত্রকরের ক্ষেত্রে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে শিল্পী ও বিজ্ঞানী বা প্রতিভাধর সৃজনশীল মানুষ সমাজ-বিবর্তনের পাথেয় রচনা করেন। তারা সমাজের যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলি সূচিত করেন অভিনব উদ্ভাবনের মাধ্যমে এবং তার দ্বারা নতুন যুগধারা প্রবর্তিত হয়। যা বহুদিন বজায় থাকে মানুষের ধ্যান, জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও রুচিতে। তৈরি হয় নতুন চাহিদা। তবে বিপরীত প্রভাবের সত্যটি কোনওমতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, সমাজ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রভাব অনেক সময় শিল্পীর কর্মের গতিপথ নির্ধারিত করে দেয়। যে পরিবেশে, সমাজে শিল্পী শিক্ষালাভ করেন, যে রুচি ও ভাবধারার আলোকে তিনি লালিত হন তার পরিপোষণ তিনি অনেক সময় অজ্ঞাতভাবেই করে থাকেন, তবে আপন দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে পরিমার্জন, পরিবর্ধন এমনকি পরিবর্তনের অবকাশ থেকেই যায়।

শিল্পকলা এবং বিশেষ করে চিত্রকলার ওপর বাংলা সাহিত্যে শিল্প ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর সুগভীর আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে, তবে তা পরিসরে সংকীর্ণ। যাঁরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন তাদের সংখ্যাও সীমিত। এই অবিস্তৃত আলোচনাতেও বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ তাঁরা করেছেন। অনেকে শিল্পীর স্বাধীনতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেশ, কাল ও সমাজের প্রভাবকে পরোক্ষ করে তুলেছেন। অনেকে কলাকৈবল্যবাদের প্রবক্তা হয়ে 'শিল্প শুধু শিল্পের জন্যই' এই মতবাদে বিশ্বাস প্রদর্শনে আগ্রহী হয়েছেন। আবার কেউ কেউ শিল্পীকে সমাজের অধীনে ভেবে শিল্পকর্মকে সমাজের দান বলে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টিত হয়েছেন। তবে সমণ্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অনেকেই শিল্পীর সৃজনশীল স্বাতন্ত্র এবং সমাজ ও কালের প্রভাবকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলায় শিল্পসমালোচকদের আলোচনার ধারাকে এই নিবন্ধে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে এই পরিচ্ছদের প্রথমে আমার নিজস্ব যে দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে তার নিরিখে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছি। উঁচু মাপের সমালোচক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রূপ রস ও সুন্দর' পুস্তকের সূচনায় উল্লেখ করেছেন, "কলাকৈবল্যবাদের আমি বিরোধী" তাঁর মতে "শিল্পীর প্রতিভা সমাজায়ত; এবং

তথাকথিত মৌলিক প্রতিভাও দেহাশ্রয়ী।"[১] তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে কোনও শিল্পের কোনও অলৌকিক সত্তা নেই।

"মনোজগত ও বস্তুজগতের বাইরে আক্ষরিক অর্থে কোনও তৃতীয় জগৎ রূপের স্বতন্ত্র জগৎ নেই।"[২]

দেবীপ্রসাদ তিনটি মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন, ১) শিল্পী সত্তা ও শিল্পবস্তুর সম্বন্ধ। ২) সমাজ ও শিল্পবস্তুর সম্বন্ধ। ৩) শিল্পীসত্তার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক।[৩] তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতোই বিজ্ঞানীর জীবন নিরপেক্ষ তার আবিষ্কারের সারবত্তা বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেক সময় শিল্পীর জীবন অভ্যস্ত থাকলেও শিল্পবস্তুর বিচারের মাধ্যমেই প্রয়োজনে শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায় বলে অনেকের বিশ্বাসকে তিনি যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তবে শিল্পীসত্তার অন্বেষণে দেবীপ্রসাদ শিল্পীর সৃষ্টির আকুতি, তার ব্যক্তিজীবন, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার শিল্পের বাস্তবধর্মিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিল্পকর্ম একপ্রকার অনুকরণ বলেও প্ল্যাটোর মতকে তিনি প্রকারান্তরে দাঁড় করিয়েছেন। তবে তিনি শিল্পীর অবচেতন মন সামাজিক সচেতনতাবোধের দ্বারা অবলুপ্ত কী করে হতে পারে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছেন। বস্তুত তাঁর মতে, অবচেতনার কোনও স্থির, স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কাঠামো নেই, এবং অবচেতন স্তর সামাজিক বাধা-নিষেধের অনুশাসন সাপেক্ষ বলেই অবচেতন স্তরও একদিক বিচারে সমাজ নির্ভর। এই যুক্তিকে নির্ভর করে দেবীপ্রসাদ বলতে চেয়েছেন, "সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশ শিল্পের রূপ ও ভাব নিয়ন্ত্রিত করে।"[৪] তাঁর মতে শিল্প হল সমাজের প্রকাশ, তবে একই দেশে বিভিন্ন সমাজ থাকতে পারে, এবং কোন শিল্পী সমাজের কোন দিকটি অনুসরণ করছেন তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। শিল্প সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বিচার করেও বলেছেন "ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শুধু অপরাধ, যৌন আবেদন ও দ্বন্দ্বমূলক শিল্পই সৃষ্টি হচ্ছে না, ধর্ম,পুরাণ, সেবা ও অন্যান্য বিষয়ক শিল্পও তো সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, সময়ের সীমা ভেঙে শিল্পী এ যুগের কথা ও-যুগে এবং ও-যুগের কথা এ-যুগেও বলতে পারেন।"[৫] শিল্পকর্মকে তিনি গোষ্ঠীকর্ম বলে দাবি করেন না। শিল্প শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়, নতুনের সৃষ্টিও বটে। তাঁর মতে শিল্প সমাজায়ত হলেও সমাজ সরাসরি শিল্পে প্রকাশিত হয় না, কিংবা প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বিত হয় না। শিল্পীর স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য সমাজের প্রভাবকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে দিতে পারে। সেদিক থেকে "শিল্পীসত্তা শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধকে প্রভাবিত করে।" তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেবীপ্রসাদ স্বীকার করেছেন শিল্পীর জীবনবোধ, জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনদর্শন ও বিশ্ববীক্ষা তাঁর শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করে। তবে বাস্তবিক যা ঘটে তা হল শিল্পবস্তুতে শিল্পী-সত্তা ও সমাজের সমন্বয়।

ফ্রয়েডিয়ান মনোবিজ্ঞানের আলোকে শিল্পকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ফ্রয়েড মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধী যে সকল কথা বলেছেন তাতেও শিল্পীদের অবদমন ও অবচেতনা কী ভাবে সমাজকে ফাঁকি দিয়ে বাস্তবকে বিকৃত করে শিল্পবস্তু রূপে প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তিমন উভয়ই

বিকৃতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। অর্থনীতি, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো শিল্পীর স্বাধীন চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করে, আবার সামাজিক পরিপোষণে শিল্পীগোষ্ঠী তৈরি করে, ঠিক তেমনি সামাজিক নিয়মের বাধানিষেধ শিল্পীর অবদমিত মনের বহিঃপ্রকাশে বিকৃতকাম শিল্প তৈরিতে সাহায্য করতে পারে, এর প্রথম দৃষ্টান্ত মার্কসের এবং দ্বিতীয়টি ফ্রয়েডের। ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের পরিপন্থায় ও পরিমার্জনে কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং-এর বক্তব্যকেও দেবীপ্রসাদ তুলে ধরে বলেছেন, "শিল্পীর চেতন ও অবচেতন মন সহ সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমাজের এবং এমনকি বিশ্বজগতের পরিকাঠামোগত সম্বন্ধে একটি মৌলিক জাতিসত্তায় (আর্কেটাইপে) বিধৃত। শিল্পীর সৃষ্টির উৎস, তার অন্তর্দৃষ্টি, ব্যক্তিগত হয়েও সামাজিক এবং জাগতিক।"[৬]

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা অমূর্ত শিল্পকর্ম বিষয়ে দেবীপ্রসাদ বলেছেন যে এই ধরনের শিল্পবস্তুতে প্রকৃতির বাস্তব দৃশ্যরূপের চেয়ে শিল্পীর ভাবরূপ বেশি প্রকাশিত হওয়ার ফলে শিল্পে অতি বেশি সাংকেতিকতা, অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, রহস্য ও ব্যঞ্জনা প্রকটিত হচ্ছে এবং ফলত সমাজের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে সমালোচকের বিভিন্নগামী ভাষ্য ও ব্যাখ্যার অবকাশ।

শিল্পবস্তুকে অনুধাবনের জন্য দেবীপ্রসাদ নির্দিষ্ট সমাজ ও ইতিহাসের পরিমণ্ডলে দেশ ও কালের বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যদিও শিল্পকর্মে শিল্পীমনের স্বকীয় চরিত্রের অবস্থিতিকে তিনি অস্বীকার করেননি।[৭]

শিল্পী, শিল্পবস্তু ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে দেবীপ্রসাদ গভীর আলোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। তাঁর ভাষার পারিপাট্য মার্গস্তরের, সাহিত্যোচিত আকর্ষণ তৈরি করেছে। এই জটিল বিষয়ের বিভিন্ন পর্যায় ও দিক বিশ্লেষণে তিনি বিভিন্ন সমালোচকের নামোল্লেখ না করেও তাদের মত গ্রহণ ও খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর যুক্তি বাংলায় শিল্প সমালোচনা সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে দেবীপ্রসাদ অনেক ক্ষেত্রে যুক্তির জটিলতা তৈরি করতে গিয়ে যা সরলভাবে আরও গভীর ভাবে রেখাপাত করা যেত কিংবা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত তা থেকে সরে এসেছেন। শিল্পীর ব্যক্তিজীবন ও সমাজের প্রভাব কীভাবে শিল্পবস্তুতে সমন্বিত হয় – তা আরও পরিষ্কার করে উপস্থাপন করলে বিশ্লেষণ জাড্যতা মুক্ত হতে পারত। রবিবর্মা, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তিতে প্রায় সমকালীন ভারতীয় সমাজের শিল্পী হয়েও কী করে অনন্য ত্রিবিধ শিল্পাদর্শের প্রবর্তন ও অনুসরণকারী হলেন সে বিষয়ে দেবীপ্রসাদের ব্যাখ্যা গ্রাহ্যতার স্তরে উন্নীত হয়নি। তাছাড়া যুক্তির স্ববিরোধিতা তাঁর ব্যাখ্যায় বর্তমান। একজন সার্থক সমালোচক হিসেবে বিভিন্ন ধারার মধ্যে সারার্থের সমণ্বয় সাধনের পক্ষে তৎপ্রেক্ষিতেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তির অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। তবে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বনিয়াদ তৈরি করে বিশ্লেষণের শুরুতে যে প্রস্তাবনাগুলিকে ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা বিশ্বজনীন ও চিরন্তন; কারণ এ-বিষয়ক প্রশ্নগুলি দর্শন, বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। তিনি বলেছেন ১) শিল্পীর প্রতিভা অনুকরণশীল অথবা

মৌলিক যাই হোক না কেন তা সমাজায়ত ও দেহাশ্রয়ী, ২) শিল্পের কোনও অলৌকিক সত্তা নেই এবং ৩) রূপের স্বতন্ত্র কোনও তৃতীয় জগৎ নেই। এই নিবন্ধের শুরুতে চিত্রকলার বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনায় এবং এই পরিচ্ছদের শুরুতে মগ্নচৈতন্যের বিশ্লেষণে বাস্তব ও অবাস্তব, লৌকিক ও অলৌকিক, মূর্ত ও অমূর্তের বিভাজন ও ব্যবধানকে শিল্পজগতের নিরিখে মনুষ্যচেতনায় এবং তার কল্পলোকের আলোতে আপেক্ষিক বলে ব্যাখ্যা করে হয়েছে। প্রতিভা অবশ্যই সমাজায়ত এবং দেহাশ্রয়ী, কিন্তু এই দেহ শুধু এক রক্তমাংস-অস্থি-মজ্জা-পিণ্ডই নয়। মানব চেতনার স্বরূপ ও মৌলিক প্রতিভার রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত ও অজ্ঞাত। মানবদেহ, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও চেতনাপ্রবাহ এই বিশ্বপ্রকৃতির এক প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই বিশ্বজগতের খবর ও রহস্য মানব দেহ-মনেই সুপ্তাবস্থায় আছে। বিবর্তনের পথে সেই অজানিত শক্তি জাগরিত ও বিকশিত হতে পারে। যেমন আমরা এই মনের ক্ষমতার সমস্ত উৎস যুক্তি ও বুদ্ধির পর্যায়ে আসে না। বর্তমান বিজ্ঞানে নিশ্চয়তার পাশাপাশি সম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তাকে (Probability and indeterminism) গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিভা দেহাশ্রয়ী হলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থে লৌকিক নয়। শিল্পের কোনও অলৌকিক সত্তা নেই – এই কথা আপাত সত্য, শেষ বিচারে সত্য কিনা বলা সহজ নয়। মনুষ্য কল্পনা লাগামহীন; কল্পনার সকল গতি লৌকিক কিনা বলা কঠিন, আবার যা একজনের বুদ্ধিগ্রাহ্য তা আর একজনের ক্ষেত্রে না-ও হতে পারে। আলোর জগৎ, শব্দের জগৎ ও রঙের জগৎ-এর জ্ঞান মানুষের সীমিত। মানুষের শ্রবণের, দর্শনের ও গন্ধগ্রহণের ক্ষমতা পরীক্ষিত ভাবেই অত্যন্ত সীমিত। ভাবের সূক্ষ্ম রূপজগৎ যা ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবের বন্ধন থেকে কল্পনার মুক্তলোকে বিচরণ করে – যা চিত্রে ও সাহিত্যে তুলে ধরা যায়, সেই রূপলোক প্রত্যক্ষ ও গ্রাহ্য বাস্তবের বিষয় নয় বলেই লৌকিক জগতেরও অবশ্যই নয়। আবার লৌকিক ও অলৌকিকের ব্যবধান অত্যন্ত আপেক্ষিক। যেমন – ক্যাঙারু তিন মাইল দূর থেকে মানুষের গন্ধ পায়, বাদুর শব্দের প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে চলতে সক্ষম, বিড়াল রাতে ও দিনে সমান দেখে, কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের কয়েকগুণ বেশি। এই সকল ক্ষমতায় মানুষ অক্ষম বলেই এগুলি অলৌকিক নয়। এখন কোনও শিল্পী উপরিবর্ণিত জীবসমূহের ক্ষমতাকে মানুষের ক্ষেত্রে আরোপ করে কল্পনাভিত্তিক শিল্পবস্তু তৈরি করলে আপাতদৃষ্টিতে তা অলৌকিক হলেও প্রকৃত বিচারে তা নয়, কারণ এই ক্ষমতা অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। লৌকিক ও অলৌকিকের বিভেদ এমনই আপেক্ষিক যে এই দুই এর ব্যবধান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ বলে ধরাও কঠিন। মানুষের রঙ-এর জগতের ধারণা শুধু ৩৫০ মিলিমাইক্রন থেকে ৬৫০ মিলিমাইক্রন ওয়েভ লেংথ পর্যন্ত। এর নীচে ও ওপরে দৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের নেই, আবার যে সকল শব্দের তরঙ্গ ১৬ সাইকেল পার সেকেন্ড থেকে ২০০০০ সাইকেল পার সেকেন্ড পর্যন্ত, শুধু সেই সকল শব্দ মানুষ শুনতে পায়, অন্য শব্দ শুনতে পায় না। রঙ আলো ও শব্দের জগতে মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে অন্য অনেক জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতা আছে, তাই বলে সেই ক্ষমতা মানুষের কাছে অলৌকিক বলেই অবাস্তব বা অ-প্রাকৃতিক নয়। মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা এতই কম ও সীমিত যে বাস্তব জগতই তার কাছে

অক্ষমতার জন্য অলৌকিক হতে পারে। কিন্তু কল্পনায় শিল্পীমন তার ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে প্রবেশ করে এবং তার শিল্পবস্তুকে সেভাবেই রূপ দেবার চেষ্টা করে, ফলে শিল্পবস্তু মাত্রেই সমাজায়ত এই দাবি সমীচীন নয়। বহুলাংশে শিল্পবস্তু কল্পনারই ফসল, যদিও সমস্ত কল্পনাই অবাস্তব নয়, আবার সর্বদংশে বাস্তবও নয়। শিল্পীর কল্পনা ও তার সৃজনশীল সৃষ্টি তার সুপ্ত ও জাগ্রত চেতনার অভিব্যক্তিকে বহন ও বিকশিত করে। কোনও সমাজের কিছু মানুষ তার শিল্পবস্তুকে স্বীকৃতি দিলেন কি দিলেন না, সে নিয়ে তিনি অবশ্যই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত নন, তাঁর তৃপ্তি তার সৃষ্টি বিকাশে। প্রকৃত শিল্পী কারও স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকেন না বা তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃতি সাপেক্ষ নয়। একথা সত্য যে স্বীকৃতিতে আনন্দ ও তৃপ্তি বৃদ্ধি পায়। তবে এমনটি বিরল নয় যে সমাজের স্বীকৃতি শিল্পীর ভাগ্যে জুটেছে তার মৃত্যুর পরে, তার সত্যিকারের মূল্যায়ন হয়েছে যখন তিনি সমাজে ছিলেন না। এ বিষয়ে আমরা বলতে পারি যে শিল্পবস্তুর প্রবৃত্তিগত ব্যতিক্রমকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে শিল্পীর শিল্পকর্ম তার সৃজনশীল ক্রিয়ার ফসল, তবে এই সৃজনশীলতার লক্ষ্য, গতিপ্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শিল্পীর মন নিরপেক্ষ বা সমাজ নিরপেক্ষ তার কোনওটিই নয় – দুইয়ের প্রভাবই বিদ্যমান; এবং শিল্পবস্তুর সত্তা আপেক্ষিক – সেক্ষেত্রে লৌকিক অলৌকিকের বিচার অত্যন্ত কঠিন।

ফ্রয়েডিয় ও মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় দেবীপ্রসাদ বিষয়ের সারাংশ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তবে আলোচনা একটু দীর্ঘায়িত হলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব হত। মূলকথা হল ফ্রয়েড ও মার্কস জীবন ও সমাজের দুটি পৃথক পৃথক বনিয়াদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন – যৌনতা ও অর্থ – দুটিই জীবনের প্রাথমিক স্তম্ভ। যৌনতা ছাড়া জীবনের বিকাশ নেই, খাদ্য ও অর্থ ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। শিল্পের প্রেক্ষিতে এর কোনওটিকেই কম গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। ফ্রয়েড ও মার্কস দুই বিপরীত মেরু তৈরি করলেও সমাজ ও জীবনের ক্ষেত্রে, শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে একই চুম্বকের দুই মেরুই সত্য।

বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'শিল্প সাহিত্য দেশকাল'[৮] নামক পুস্তকে মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ সৃজনশীল বলেই স্বাধীন, এবং সৃজনশীলতা মানুষের ধর্ম বলেই স্বাধীনতার স্পৃহা তার স্বধর্ম, এবং অপরদিকে সে সমাজবদ্ধ জীব বলেই সমাজের নিয়ম তার স্বভাবের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট। মানুষ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও দেশকালের ছাপ ও সমাজের প্রভাব মানুষের ক্রিয়াকর্মে অনিবার্য। ঐতিহাসিক দিক বিচারে শিল্পের নিয়ন্ত্রণে সমাজপতিদের ভূমিকা অতীতে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যবাদের তত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দুটিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। শিল্পী সৃজনশীল স্বধর্মকেন্দ্রিক হলেও তার সার্বিক স্বভাব সমাজবদ্ধতার ফসল। "সব শিল্পই টেকনিক নির্ভর। . . .সবটা না হোক, টেকনিকের বেশিটাই সমাজের দান।"[৯] শিল্পীর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বাইরে মনুষ্যরচিত ও সৃষ্ট যা কিছু সবকিছুই শিল্পীর কাছে সমাজ; আবার শিল্পীর ভৌগোলিক পরিবেশ বা তার দেশীয় প্রকৃতিকেও অস্বীকার করার মতো নয়। কৃষিজীবী

দেশের শিল্পী তার শিল্পসাধনায় দেশকে যেভাবে তার সৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলবেন শিকারীজীবীদের শিল্পী সেভাবে হয়তো তুলবেন না।

সময়ের দূরত্ব অতীতের নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিসকেও শিল্পবস্তুরূপে চিহ্নিত করতে মানবমনকে উদ্বুদ্ধ করে। অতীতের যুদ্ধাস্ত্র, হাতিয়ার, সাধারণ চিত্রকলা, দেবালয়, দেব ও দানবমূর্তি সবই শিল্পবস্তুরূপে পরিগণিত হয়। জীবনের যে প্রকাশ সমাজ, সেই প্রকাশের গতিপথেই গড়ে ওঠে শিল্প। মানুষ ও সমাজ ব্যতীত শূন্য থেকে শূন্যে কোনও শিল্প তৈরি হয় না।

শিল্পালোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ তিনটি ধারাকে চিহ্নিত করেছেন – ১) মনস্তাত্ত্বিক, ২) সমাজতাত্ত্বিক ও ৩) শিল্পরীতিভিত্তিক অথবা স্টাইলিস্টিক। এর প্রথমটি জোর দিয়েছে শিল্পীর মনোজগত ও তার ব্যক্তিজীবনের ওপর, দ্বিতীয়টি সামাজিক শক্তিনিচয়, সমষ্টিগত ও বলক্রিয়া সমাজের প্রভাব ও পরিবেশের ওপর, তৃতীয়টি শিল্পের মূল্যায়ন করেছে শিল্পরীতির ইতিহাস, তার ক্রমবিবর্তন ও স্টাইলের ধারাবাহিকতা, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের ওপর। এই তৃতীয় ধারাটিকে অনবদ্য শিল্পকর্মপ্রবাহও বলা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই তিনটি ধারার কোনওটিই এককভাবে সত্য নয়। তারা পারস্পরিক নির্ভরশীল। সামাজিক শক্তি, শিল্পপ্রবাহ এই দুয়ের মাঝখানে শিল্পীর মন ও তাঁর 'রহস্যময় জগৎ' সংযোজনী শক্তিরূপে শিল্পবিকাশে সৃজনক্রিয়ায় প্রবহমান। সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাস ও সমাজের নিরিখে শিল্পালোচনা করতে গিয়ে শিল্প সম্পর্কে হেগেল, বাক্‌ল ও তেইন-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রগতিসম্পন্ন ইতিহাস দেশ ও কালের আধারে বিবর্তনের মাধ্যমে কী করে শিল্পে জাতীয় চরিত্র ও সত্তাকে বিকশিত করে এবং কীভাবে 'স্পিরিট' কালের গতিপথে জাতিসত্তায় বিকশিত হয়ে যুগোপযোগী রূপকল্প (will to form), শিল্পে কালচেতনা (Zeitgeist) বা যুগধারণা (Climate of opinion) সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সমষ্টিগত শক্তি ও সংহতির বনিয়াদ তৈরি করে, এবং কী করে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিসত্তা বিবর্তিত শিল্পায়িত জাতিসত্তার অংশরূপেই প্রস্ফুটিত হয় – হেগেলীয় দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পে সমাজের অন্তঃস্থিত প্রভাব ও সমাজচৈতন্যের ব্যাখ্যা হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এই ব্যাখ্যাকে রোমান্টিক ও ভাববাদী বলে অভিহিত করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এই ব্যাখ্যায় তত্ত্ব ও সমাজ বর্তমান থাকলেও সমাজতত্ত্ব অনুপস্থিত। বাক্‌ল ও তেইন সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেশকাল, জলবায়ু, সমাজসংগঠনকে শিল্পবিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও শিল্পের মূল প্রযোজক শক্তির সন্ধানে বেশিদূর যেতে পারেননি বলে সত্যেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন।[১০]

হেগেলীয় শিল্পচিন্তার সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পের গোড়ার সন্ধানে মার্কসীয় শিল্প ব্যাখ্যার আলোচনা করেছেন। মার্কস ইতিহাসের গতিপথে উৎপাদন শক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদ বণ্টনভিত্তিক সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর নিরিখে শিল্প-সাহিত্য বিকাশের উৎস সন্ধান করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তা অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। মার্কসের বস্তুভিত্তিক ব্যাখ্যার মধ্যেই

শিল্পজগতের বিকাশের গোড়া দেখতে পেয়ে মার্কস-পূর্ব যুগের ভাব-চৈতন্যবাদীদের চেয়ে মার্কসের বস্তুবাদকেই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে তিনি মনে করেছেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিন্যাস হচ্ছে মূল এবং শিল্প-কলা-সাহিত্য হচ্ছে ফুল আর সমাজ হচ্ছে মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কাণ্ড। মার্কস সেই মূলের বিন্যাসকে শিল্পকলার আসল প্রযোজক শক্তিরূপে ধরে নিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মার্কসীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন – "মার্কস এর শিল্প ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা যত সহজ, খণ্ডন করা তত সহজ নয়। . . . সমাজতাত্ত্বিক শিল্পব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে এবং সে ব্যাখ্যাকে বস্তুভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হলে – নিছক দৈবী ব্যাখ্যায় অনাগ্রহী হলে, অন্য কোন বিকল্প ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে।"[১১] তিনি আবার বলেছেন, ". . . মানুষের সব ক্রিয়াই বস্তু নিয়ন্ত্রিত; তার ভাবনাও, তার চৈতন্যও এক রকমের বস্তু নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া – সমাজতাত্ত্বিক সমস্ত ব্যাখ্যারই এই হল ভিত্তি স্থানীয় প্রত্যয়। একে অস্বীকার করলে দৈবী ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"[১২] তবে সত্যেন্দ্রনাথ মার্কসীয় মতাদর্শ থেকে কিছুটা সরে এসে বস্তু ও ভাব-চৈতন্যকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। শিল্পবিকাশে বস্তু ও ভাব-চৈতন্য গুরুত্বে সমান ও সম্পর্কে পারস্পরিক। এই প্রেক্ষিতে নিজের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনেক মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিক এই সত্যটার (বস্তু ও ভাবের পারস্পরিকতার সত্য) গুরুত্ব অনেক সময় উপলব্ধি করেন না। কিন্তু সেটা মার্কসবাদের নিজস্ব ত্রুটি নয়, সমাজতাত্ত্বিক শিল্পব্যাখ্যার অপরিহার্য গলদ নয়। সেটা সমাজতাত্ত্বিক শিল্প ব্যাখ্যার প্রয়োগের ত্রুটি।"[১৩] তবে এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ মার্কসকে যেভাবে মুক্তি দিয়ে মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিকের ওপর দোষ চাপিয়েছেন তা সমীচীন নয়। কারণ কোনও মার্কসবাদী মার্কসের শিল্প সম্পর্কীয় ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে উপরিবর্ণিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেননি। স্বয়ং মার্কস বস্তুকে মুখ্য বা প্রাইমারি এবং চেতনা বা ভাবচৈতন্যকে গৌণ বা সেকেন্ডারি বলে তাঁর বস্তুবাদে বর্ণনা করেছেন এবং এই তত্ত্ব মার্কসবাদের বনিয়াদ তৈরি করেছে। এতে কোনও ত্রুটি সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণে ধরা পড়ে থাকলে তার জন্য তিনি কোনও মার্কসবাদীকে দায়ি না করে স্বয়ং মার্কসকেই দায়ি করতে পারতেন, তবে এ বিষয়ে আরও গভীর অনুসন্ধিৎসা ও আলোচনায় ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যিক। শিল্পরীতিভিত্তিক বা স্টাইলিস্টিক ধারাকে পর্যালোচনা করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রতি যুগের শিল্পাদর্শ, শিল্পদৃষ্টি, শিল্পাভিপ্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র – এই যুক্তি খণ্ডিত-সত্যের অধিকারী এবং সত্য এর মধ্যে যেটুকু আছে সেটুকু আপেক্ষিক। তাছাড়া "একই কালে একই দেশে কেমন করে সম্পূর্ণ পৃথক শিল্পরীতির সহাবস্থান ঘটতে পারে, তাও শিল্পরীতিগত ব্যাখ্যায় বোঝা সম্ভবপর নয়।" এই রহস্যের কিনারা করার জন্য সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং শ্রেণীবিন্যাসের সত্যকে বুঝতে হবে, তিনি মন্তব্য করেছেন।

সর্বশেষে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অনেকাংশে সমালোচনা করে যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "সমাজ শিল্পকে যতই প্রভাবিত করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা প্রভাবই, সৃষ্টি নয়। সমাজ শিল্পকে সৃষ্টি করে না, ব্যক্তিই শিল্পের স্রষ্টা। শিল্পের আসল রহস্য ব্যক্তির মধ্যে

নিহিত।"[১৪] উপরোক্ত মন্তব্য সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ববর্ণিত, বিশেষ করে মার্কসীয় শিল্পাদর্শের আলোচনায় উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে অনেকাংশে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুজগৎ ও শিল্পজগৎ এর মাঝখানে বিরাজমান এক শূন্যতা বা ফাঁক; এবং শিল্পীর মনোজগতই এই দুই জগতের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই ফাঁকের জগৎকে তিনি রহস্যময় রসলোক ও 'সম্ভোগের জগৎ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে তা রসলোক হয়ে উঠেছে সে স্থানে একমাত্র মনোজগতের অবস্থানের জন্যই। আর এই মনোজগতই বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কে শিল্পজগতের সৃষ্টি করে।

সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমালোচনা করে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, এই ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা অলঙ্ঘনীয়। সমাজের প্রভাবই প্রযোজক ও নির্ণায়ক হলে একই সমাজে, একই পরিবেশে সকলেই শিল্পী হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় না। আবার একই সমাজে সমকালীন যুগে যে সকল শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি সমান বা একমুখী নয়। সমকালীন যুগের একই সমাজ ও পরিবারের হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম অবনীন্দ্রনাথের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এ প্রশ্ন তিনি করেছেন। শুধু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণা দিয়েও এ-রহস্য বোধগম্য নয় বলে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। এই রহস্যের ভেদ একমাত্র সম্ভব শিল্পীর ব্যক্তিজীবন, তাঁর সৃজনীশক্তি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির গভীরতা, প্রকাশের নৈপুণ্য প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ব্যক্তিজীবনের অতীত উদ্ঘাটনের কৌশল এবং ইয়ুং এর গোষ্ঠীজীবনে সঞ্চিত স্মৃতির সাহায্যে শিল্পজগতের অনেক দুর্বোধ্য বিষয়কে সুবোধ্য করা গেছে। তবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও অনেক কিছুর হদিশ দিতে পারেনি বলে সত্যেন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন।

শিল্পসন্ধানের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক তথ্যকে সমাজতাত্ত্বিক অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব দুটিই বিজ্ঞানধর্মী। শিল্পী মনের স্বাধীনতা ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ এই দুই এর সমণ্বয় সাধনের কথা তিনি বলেছেন। "শিল্পের খানিকটা নিয়ন্ত্রিত, খানিকটা অনিয়ন্ত্রিত – বলতে পারি, স্বাধীন, মুক্ত, দুটি দুই বিপরীত কোটির সত্য। প্রত্যেক শিল্পবস্তুর মধ্যে এই দ্বৈতভাব প্রকাশ। প্রত্যেকটি সার্থক শিল্পবস্তুতে এই দুই শক্তির সূক্ষ্ম ভারসাম্য ঘটে।"[১৫] তিনি আবারও বলেছেন, "যূথবদ্ধতা যেমন মানুষের আদিম সত্য, সম্ভবত স্বাধীনতাও তাই। . . . মানুষের শিল্পেও এই দুই বিপরীতের লীলা।" শিল্পবিকাশে স্বাধীনতা ও সামাজিকতা, একদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা, অপরদিকে সামাজিক বন্ধন, দায়বদ্ধতা, সামাজিক বিধিনিষেধের চাপ, ন্যায় অন্যায়ের পরিগণ্ডী মেনে চলার বাধ্যবাধকতা প্রভৃতির সামঞ্জস্যবিধান অবশ্যই ঘটে। স্বাধীনতাবিহীন সৃষ্টি সম্ভব নয় আবার সমাজবিহীন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সার্থকতার কোনও মূল্যায়ন হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। তবে মনস্তাত্ত্বিক তথ্যকে সমাজতত্ত্বের অঙ্গীভূত করা যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ অবশ্যই আছে। দ্বিতীয়ত মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব দুটিই বিজ্ঞানধর্মী কিনা – সে প্রশ্নও উঠতেই পারে। মনস্তত্ত্ব অনেকটাই বিজ্ঞানধর্মী ও বিজ্ঞানভিত্তিক, কিন্তু সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানধর্মী হতে পারে না, কারণ সমাজ কোনওকালেই

বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি হয়নি। সমাজের কোনও বিশ্বজনীন পরিকাঠামো নেই – সমাজ বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা-ভাষী মানুষের সমবায়ে তৈরি এবং সমাজ বিভিন্ন দেশ ও কালে বিভিন্ন রীতি ও নীতি অনুসরণ করে এসেছে। তাছাড়া যে ব্যক্তি যত বেশি জ্ঞানী এবং যত বেশি উদার মনের অধিকারী, সে ব্যক্তির সমাজের পরিধি তত বেশি বিস্তৃত। বস্তুত কারও সমাজ তার গ্রামেই সীমাবদ্ধ, কারও তার দেশে, কারও সমাজ সারা বিশ্বে। জৈন, বৌদ্ধ ও তাও – প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীদের সমাজ শুধু মনুষ্যসমাজ নয়, তাদের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজীবের প্রতি একাত্মবোধের অনুভূতিতে সঙ্কীর্ণতা ও সীমার উত্তরণে স্বরূপত প্রাকৃতিক ও বন্ধনহীন। তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিজেরাই উঁচুমাপের চিত্রশিল্পী, এবং তাঁদের চিত্রে গভীর বৌদ্ধদর্শনকেই তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ্যনীয়। সেখানে কোনও নির্দিষ্ট সমাজ স্থান পায়নি। স্থান পেয়েছে বুদ্ধের মানবধর্মের কাহিনী। জীবনে সংসারচক্রে দুঃখকে কী করে নিবারণ করা যায় – তার আদর্শ, তত্ত্ব, তথ্য ও কল্পনা। তাছাড়া সমাজের কোনও নির্দিষ্ট কৃষ্টি-সংস্কৃতি নেই, সমাজ অবিভাজ্যও নয়। জাতিভেদে, ধর্মভেদে, শ্রেণীভেদে, দেশ ও কাল ভেদে এবং বিবর্তনের মাত্রার কম-বেশিতে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত; সারা বিশ্ব জুড়ে কোনও অবিভাজ্য সমাজের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি খণ্ডাংশ ছাড়া সমাজের কোনও অস্তিত্বই নেই; অস্তিত্ব আছে গোষ্ঠীর, দল-উপদলের, জাতিসত্তার, ধর্মীয় গোষ্ঠীর, শাসকের শাসন ও রাষ্ট্রের আইন ও কানুনের এবং উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময় ব্যবস্থার। এই সমস্ত কিছুকে মিলিয়েই আমাদের অস্পষ্ট ধারণা হল সমাজের। "মানুষ সমাজবদ্ধ জীব" – এতে যা প্রকৃতপক্ষে আছে তা হল গোষ্ঠীবদ্ধতা। জাতিগত ঐক্য, নির্দিষ্ট ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রবণতা, বিভিন্ন দলের, গোষ্ঠীর, ধর্মের, শাসকের এবং রাষ্ট্রের অনুশাসন মেনে চলার প্রবণতা। সমাজের কোনও একক সংহতি নেই। আসলে সমাজ হল অনেক কিছুর সমষ্টিকে নিয়ে একটি অমূর্ত ধারণা। পরিশেষে সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পের ব্যাখ্যা ও বিচারের মধ্যে এক ব্যবধান নির্ণয় পূর্বক ব্যাখ্যার সঙ্গে তথ্যকে এবং বিচারের সঙ্গে ভ্যালু বা মূল্যবোধকে সংযুক্ত করেছেন। তথ্য জগৎকেন্দ্রিক এবং ভ্যালু জীবনকেন্দ্রিক; এবং জগৎ ও জীবনের যোগসূত্রভিত্তিক তথ্য ও মূল্যবোধের নিবিড় সম্পর্কের খোঁজ করেছেন। জীবন গতিশীল বলে 'ভ্যালু'ও রূপান্তরশীল। তবে পরিবর্তনশীল ভ্যালুর স্বীকৃতি নিয়ে সমাজে জাড্যতা আছে। "সমাজ অধিকাংশ সময়ই শিল্পের মূল্য-বিচার করে পুরনো প্রতিষ্ঠিত মূল্যমান দিয়ে। . . . কখনো কখনো জীবনই সমাজের হাতে নতুন মানদণ্ড তুলে দেয়।"[১৬] আপেক্ষিক কম পরিবর্তনশীল সমাজ রূপান্তরিত ভ্যালুকে সহসা স্বীকার না করে নিলেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। "যে ভ্যালুর দ্বন্দ্বে সমাজ সতত-সংক্ষুব্ধ, সেই ভ্যালুর দ্বন্দ্বেই শিল্পও সতত গতি-চঞ্চল। এই দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই শিল্প ও সমাজ পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করে।"[১৭] তার মতে সমস্ত সার্থক শিল্পই সমগ্র অতীত শিল্পের অতিক্রমণ, সমস্ত পুরনো শিল্পের লঙ্ঘন। সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পের ব্যাখ্যা ও বিচার এবং তথ্য ও মূল্যবোধের মধ্যে যে তফাৎ টেনেছেন তার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য হলেও, সেটি কোনও মৌলিকতার দিক নির্দেশ করে না। মূল্যবোধ ও ব্যাখ্যার সার্বিকতাধীন হতে

পারে; আবার তথ্যও বিচার-বিশ্লেষণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া জগৎ ও জীবনের মধ্যে সত্যিকারে কোনও তফাৎ নির্ণয় দৃষ্টির সংকীর্ণতার নামান্তর। সবই জীবনের অংশ, আবার সবই জগতের অংশ। এক কথায় জীবন ও জগৎ অভিন্ন – জগৎ জীবনের ভূমি এবং জীবন জগৎ এর বিকাশ; আবার এটি বিপরীতভাবেও সত্য হতে পারে। অন্তরানুভূতি স্তরে এই সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং শিল্পী প্রতীতি মাধ্যম সে উপলব্ধির স্তরে পৌঁছলে তার শিল্পকর্মও জগৎ ও জীবনের সম্পর্কের এই অভিন্নতাকে তুলে ধরতে পারেন।

শিল্পের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ বাংলা শিল্পসাহিত্যে বিস্তৃত না হলেও বিভিন্নভাবে হয়েছে। সন্তোষকুমার বসু 'ভারত শিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থে বিভিন্ন যুগে সমাজের শ্রমভিত্তিক শিল্পকলা কী করে গড়ে উঠেছে তার বর্ণনা করেছেন। তার এই বিশ্লেষণী দিকনির্দেশ মৌলিকতা ও অভিনবত্ব দাবি করে। শ্রম হল সমাজ, জীবন ও সাংস্কৃতিক বনিয়াদ। এই শ্রমের বিবিধ ধারা শিল্পীকে শিল্পবস্তু তৈরিতে কেমন ভাবে প্রভাবিত করেছে এতদ্‌বিষয়ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্তোষকুমার ভারতশিল্পে সমাজের শ্রম-প্রভাব ব্যাখ্যায় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এই দুই দিককেই তুলে ধরেছেন। তবে এই নিবন্ধে শুধু চিত্রকলায় শ্রমবিষয় কীরূপ স্থান পেয়েছে এবং সে বিষয়ে সন্তোষকুমার যে আলোচনা করেছেন শুধু পর্যালোচনা করা হয়েছে। যে চিত্রবস্তু নিয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন সেগুলি হল ঃ

১) মশক ও জলপাত্র হাতে ভিস্তি (কালীঘাট চিত্রকলা)

২) অভিষেক দৃশ্য, কলস বাহক, অজন্তা

৩) অভিষেক দৃশ্য, মহাজনক জাতক, অজন্তা

৪) লেখনরত শিল্পী মীর আবদাল্লা

৫) পদ্মসরোবরে পুষ্প সংগ্রহরত স্বল্পবাস পুরুষ, ভিত্তিচিত্র, সিত্তনবাসল।

৬) বাঘ শিকার, কালীঘাট

৭) মহাউমগ্‌গ জাতক

৮) ষড়দন্ত জাতক, ভিত্তিচিত্র, অজন্তা

৯) মৃগজাতক, ভিত্তিচিত্র, অজন্তা।

১০) কর্মরত মণিকার, মুঘল চিত্রকলা

১১) পাতনের কারিগর, মুঘল, অণুচিত্র

১২) হলকর্ষণের চিত্র, মধ্যযুগীয় পুঁথিচিত্র . . . প্রভৃতি।

তাঁর আলোচনার শুরুতেই সন্তোষ বসু উল্লেখ করেছেন, ". . . ভারতশিল্পের মধ্যে একটা স্থায়ী মানবমুখীন মূল্য আছে, যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন কখনোই অস্বীকার করা যায় না।"[১৮] শিল্পের এই মানবমুখীনতা বলতে জীবনমুখীনতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতিই ইঙ্গিত করে এবং শ্রম হল জীবনাশ্রয়ী

ভাবের প্রকাশ। সমাজ ও মানবিকতা শ্রমবিহনে গতিহীন ও অচঞ্চল। তবে শিল্পবস্তুতে শ্রমবিকাশের ওপর তেমন আলোচনা বাংলায় হয়নি বলে লেখক মন্তব্য করেছেন, "শ্রমচেতনা ও কর্মোদ্যমের দেহজ প্রকাশ এমনই একটা বিষয় যে যা নিয়ে বাংলায় কোনও আলোচনার ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। দৈহিক শ্রমের চেতনা ভারতীয় সাহিত্যে অবশ্যই আছে। . . . চিত্রে ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে প্রকাশিত দেহজ শ্রমের অভিব্যক্তি সাহিত্য ও লোককথায় তুলনামূলক বিচারে ও পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হলে তার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। . . . বর্তমান প্রবন্ধটি একটি প্রাথমিক অনুসন্ধানমূলক আলোচনার সূত্রপাত বলে ধরে নেওয়া যায়। শ্রম চেতনার এই আলোচনাকে সাহিত্যালোচনার ইতিহাস এবং সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাখলে কাজটি সম্পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারে।" সন্তোষকুমার বসুর বিশ্লেষণের পরিধি ইতিহাসের নিরিখে সুদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত। চিত্রের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তিনি বিভিন্ন যুগে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের যে রূপ চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে তার বিভিন্ন বিষয়, ভাব, ভঙ্গিমা আলোচনা করেছেন। শিল্পে শ্রমভিত্তিক জীবনের রূপ, তাৎপর্য ও পরম্পরা নির্ণয়ে লেখক প্রাগৈতিহাসিক স্পেনের আলতামিরা গুহা ও সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে কালীঘাট পটুয়া পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত কিংবা অধারাবাহিক হলেও বিভিন্ন চিত্রবস্তুকে তুলে ধরেছেন। এই সকল চিত্রের মধ্যে অবশ্যই ভারতীয় উদাহরণের সংখ্যা বেশি। এর মধ্যে অজন্তার ভিত্তিচিত্র এবং মোঘলচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। ষড়দন্তজাতকের দৃশ্যে হস্তীদন্ত কর্তনরত শ্রমিক এবং পরে সেই দন্ত বাঁকে বহনরত শ্রমিকের দৃশ্য এবং অভিষেক দৃশ্যে জলকুম্ভ বহনকারী ও অন্যান্য কর্মে ব্যস্ত শ্রমিকের দৃশ্য সমাজের নীচুতলার মানুষের কর্মের মাধ্যমে সমাজের উঁচুতলার শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছাপূরণে অবদানের সত্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তামিলনাড়ু রাজ্যের সিত্তনবাসলে একটি গুহার স্বল্পবাস পরিহিত পদ্মসংগ্রাহকের কর্মাবস্থার চিত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্মসংগ্রাহকগণ অবশ্যই নিজের প্রয়োজনে অতি কষ্টে ফুল সংগ্রহ করতেন না। ফুল সংগ্রহের মাধ্যমে তারা জীবিকা অর্জন করতেন এরূপ ভাবাই স্বাভাবিক। চিত্রে চারুকলার গুণগত মান অতি উঁচু মাপের সন্দেহ নেই। লেখক উল্লেখ করেছেন – "নগ্ন পুরুষ দেহ, যা অতি ক্ষীণ – কটিসূত্র ও কৌপীনে ও কোন কোন ক্ষেত্রে কণ্ঠহারে সজ্জিত। এই সমস্ত পুরুষ মূর্তির দেহের নিম্নাংশ প্রস্ফুটিত পদ্মে ও পদ্মপাতায় আবৃত। দেহের চারপাশেও ঘন পদ্মবন এগিয়ে এসেছে। পদ্মমৃণালের ফাঁকে মাছ ভেসে চলেছে। কোথাও জলচর পাখি বা হাঁস ফুল তোলার কাজে ব্যস্ত মানুষদের দেখে পাখা ঝাপটিয়ে কলরব করে উঠেছে। একটি ছবিতে আমরা ফুল সংগ্রাহককে বা হাতে একাধিক পদ্মমৃণাল ধরে আছেন দেখছি। পদ্মের এই বোঝাটি সংগ্রাহকদের বামস্কন্ধে রাখা। সংগ্রাহক ডান হাতে একটি মৃণালসহ পদ্মকলি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে ধরে রেখেছেন।" শ্রমের দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী প্রকৃতির অপূর্ব রূপকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন এবং সন্তোষকুমার তার নিজের ব্যাখ্যাতেও সেই উৎকর্ষতাকে বর্ণনা দিতে অবহেলা করেননি। পদ্ম, পদ্মমৃণাল, পদ্মপত্র এবং সজীব মৎস্যের সঞ্চরণশীল দৃশ্য – এই সমস্ত মনোহরণকারী প্রাকৃতিক দৃশ্যকে শিল্পী গুহার দেয়ালে তুলির বুলিতে

রঞ্জিত করেছেন। সরোবর, পুকুর ও পদ্মসংগ্রহ ভারতীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক সৌন্দর্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির স্থায়ী অবস্থা। তবে সন্তোষকুমার চিত্রে শ্রমের সামাজিক দিকটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন – " . . . স্বলবাস পরিহিত প্রায়-নগ্ন শ্রমজীবী মানুষ যাঁরা গা ডুবিয়ে পদ্মফুল আর কুমুদ তুলে আনেন এবং পূজার অর্ঘ্য ও উৎসবের প্রাঙ্গণ পুষ্পসম্ভারে সাজিয়ে দেন, তাঁদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গভীর স্বাজাত্যবোধ না থাকলে ভারতের শিল্পী সিত্তনবাসলের চিত্র সম্পূর্ণ করতে পারতেন না। ভারতের শ্রমজীবী মানুষ বহু যুগ ধরে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সখ্যতার বন্ধনে যুক্ত। ভারতের ব্যাধ, জালিক, লুব্ধক কখনওই ঐতিহ্যের বাইরে গিয়ে অকারণে পশুপাখি উদ্ভিদকে বিনষ্ট করেন না। শ্রম ও শ্রমজীবনের অতুলনীয় ছবি হিসেবে সিত্তনবাসলের চিত্রকলাকে আমরা বর্ণনা করতে পারি। এই ছবি শান্ত কর্মমগ্ন ও সরল সহিষ্ণু এবং পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম মানুষের গৌরবময় রূপায়ণ।"[১৯]

সময়োচিত ও যথোচিত মূল্যায়ন কেন শিল্পসমালোচনার জগতে হবে না, কেন শুধু রূপকেন্দ্রিক চিত্রকলার আদর সিত্তনবাসলের এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের মূল্যায়নকে ছাড়িয়ে গেল সে বিষয়েও কারণ অণ্বেষণ করেছেন সন্তোষকুমার। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "আমরা নান্দনিক মূল্যায়নের অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলে যতটা অভিভূত হয়ে পড়ি, ততটা বিচলিত কিন্তু সহজ শ্রমদৃশ্যের মনোগ্রাহী রূপায়ণে হই না। এই কারণেই দক্ষিণ ভারতের চোল আমলের ভিত্তিচিত্র প্রভৃতির শ্রমদ্যোতক বিষয় ও আঙ্গিকের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ এখনও হয়ে ওঠেনি।"[২০] সন্তোষকুমারের এই বক্তব্যের যাথার্থ্য অস্বীকারের উপায় নেই। অনেক সময় যুক্তিবাদী নিদর্শনের চেয়ে শুধু রূপসন্ধানী আবেগ চিত্রালোচনার নির্ধারিকা হিসেবে প্রতিভাত হলে বিষয় বিশ্লেষণ উপযুক্ত গুরুত্ব পায় না। চিত্রে বিষয় এবং বিষয়ের রূপবিন্যাস এই দুই এর মধ্যে সংযোগ, সামঞ্জস্য ও আত্মীকতা না থাকলে বিষয় রূপাশ্রয়ী এবং রূপ বিষয়াশ্রয়ী হতে পারে না। সেদিক থেকে বিষয়ের বিচার করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পবস্তুতে শ্রমজীবন কীভাবে স্থান পেয়েছে এবং শ্রমবিষয়ক চিত্র কীভাবে রূপমাধুরিমা লাভ করেছে তার বিশ্লেষণের প্রয়াস বাংলা চিত্র সমালোচনা সাহিত্যে বিরল।

গ্রন্থ নির্দেশিকা ঃ

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; রূপ, রস ও সুন্দর, ঋদ্ধি ইন্ডিয়া, কলিকাতা ৯, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৩
২। ঐ, পৃ ১৩
৩। ঐ, পৃ ১-২
৪। ঐ, পৃ ৩
৫। ঐ, পৃ ৫

৬। ঐ, পৃ ১০

৭। ঐ, পৃ ১৩

৮। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শিল্প সাহিত্য দেশকাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮১

৯। ঐ, পৃ ৪

১০। ঐ, পৃ ১০-১১

১১। ঐ, পৃ ১২

১২। ঐ, পৃ ১২

১৩। ঐ, পৃ ১৩

১৪। ঐ, পৃ ১৫-১৬

১৫। ঐ, পৃ ১৮

১৬। ঐ, পৃ ২০

১৭। ঐ, পৃ ২১

১৮। সন্তোষকুমার বসু, ভারত শিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ, দীপায়ন, কলকাতা ১৯৯১, পৃ ২

১৯। ঐ, পৃ ১৬-১৯

২০। ঐ, পৃ ১৯